শিশু মনে দ্বীনের আলো ৩

আকাইদ ও আখলাক
ফিকহ ও আহকাম
আদ'ইয়্যাত ও আদাব
কাসাসুল আম্বিয়া
সিরাতুন নবী সা.
হিকায়াতুস সাহাবা

বয়স
৯ - ১০

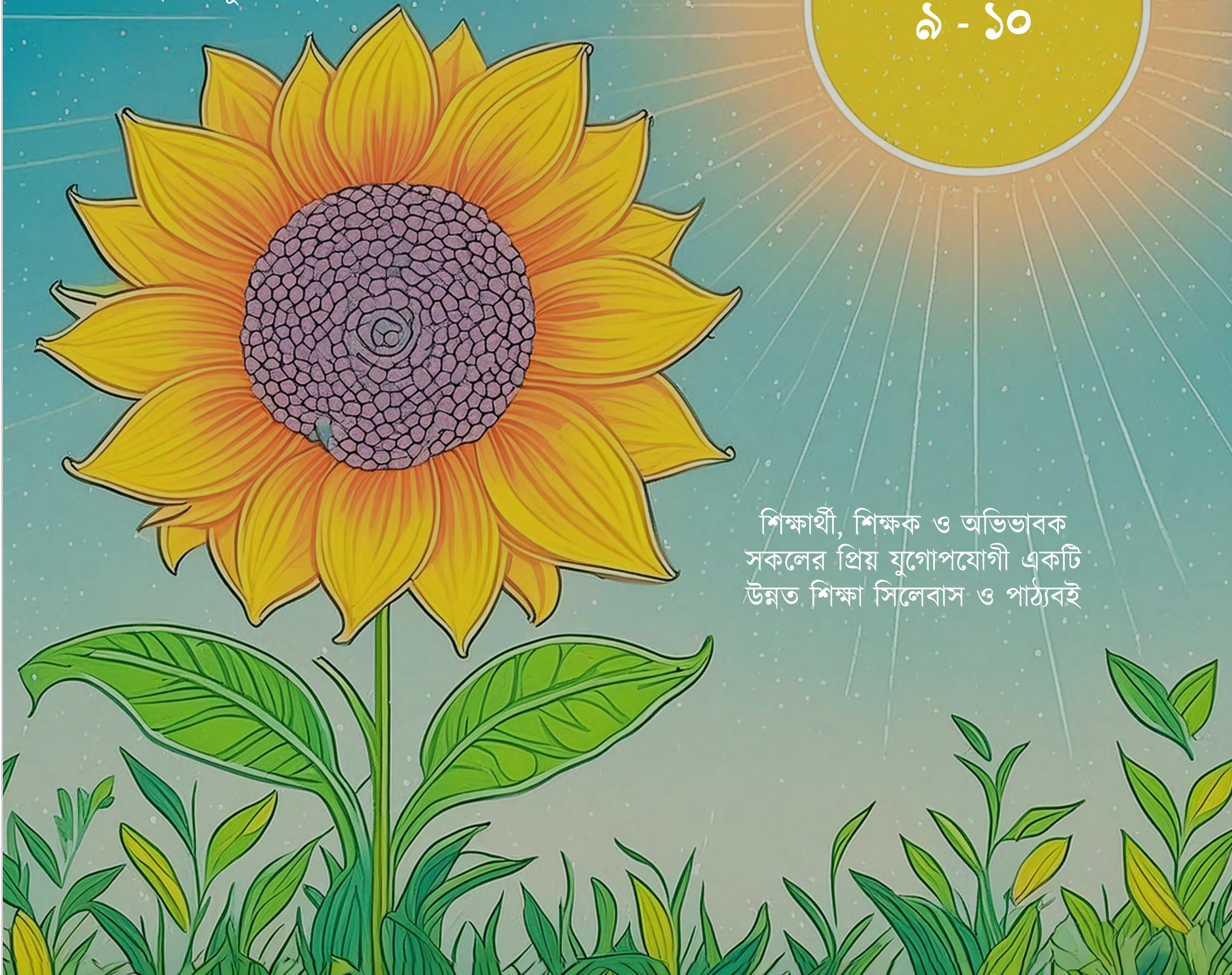

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক
সকলের প্রিয় যুগোপযোগী একটি
উন্নত শিক্ষা সিলেবাস ও পাঠ্যবই

ভূমিকা

শিশুদের যেভাবে গড়ে তুলবেন, তারা সেভাবেই বেড়ে উঠবে। আজকের অবোধ শিশুটি উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে আগামী দিনের আলোর দিশারী হবে। শিশুর কচি মনে সত্য ও সুন্দর গেঁথে দিতে পারলে তা ফুলে-ফলে সুশোভিত হবেই একদিন। দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাগুলো এক একটি উজ্জ্বল বাতি, যা শিশু মনে আলো ছড়িয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কে করবে আলোকিত। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুশিক্ষা পাওয়া প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার।

শিশুদের এ অধিকার যেমন তাদের পিতা মাতার উপর, তেমনি তাদের শিক্ষক ও সমাজের কর্তাব্যক্তিদের উপর। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন সুশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, তেমন রয়েছে উন্নত শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা। সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে সুন্দর পরিবেশের পাশাপাশি প্রয়োজন উন্নত মানের শিক্ষা উপকরণ। *'শিশু মনে দ্বীনের আলো'* বইটি সে প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সহজ করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বইটিতে। শিশুদের গড়ে তুলতে পারিবারিক পরিবেশে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানভাবেই বইটি ব্যবহার করা যেতে পারে। বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিশুদের উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য এক একটি *"এনিমেশন ভিডিও"*। বইয়ের সাথে ভিডিওগুলো মিলিয়ে শিশুদের তারবিয়াত শিক্ষা দিলে আশা করি সত্যিই তারা ভালো ঈমানদার হিসাবে গড়ে উঠবে । পূরণ হবে পিতা মাতা, শিক্ষক ও সমাজের আশা।

প্রাথমিক স্তরের *'ইসলাম শিক্ষা'* বিষয়ের এটি তৃতীয় বই। প্রথম ও দ্বিতীয় বই দুটি ইতোপূর্বে শিক্ষক, অবিভাবক ও সুধী মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। পরবর্তী বইগুলো শীঘ্রই আসছে, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান তারেক
ডিরেক্টর, বালাগ ইনস্টিটিউট
নিউক্যাসল, ইউ কে

সূচিপত্র

আকাইদ (ঈমান ও বিশ্বাস) -- ০১ - ১০
পাঠ ১: আল্লাহ: আল-আলিম (সর্বজ্ঞ) ------------------------------------ ০৫
পাঠ ২: আল্লাহ:আল-বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) ------------------------------------ ০৫
পাঠ ৩: ঈমানের ৭টি বিষয় --- ০৫

আখলাক (নৈতিক চরিত্র) --- ০১ - ১০
পাঠ ১: নিজের প্রতি সম্মান -- ০৫
পাঠ ২: পিতা-মাতার প্রতি সম্মান -- ০৫
পাঠ ৩: পরিবেশের প্রতি সম্মান --- ০৫

ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) --- ০১ - ১০
পাঠ ১: গোসল -- ০৫
পাঠ ২: আজান --- ০৫
পাঠ ৩: সালাত --- ০৫
পাঠ ৪: ঈদ আল-ফিতর ও ঈদ আল-আযহা ------------------------------ ০৫

আদ'ইয়্যাত ও আদাব (দুয়া দুরুদ ও শিষ্টাচার) ---------------------------------- ০১ - ১০
পাঠ ১: ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুয়া ---------------------------------- ০৫
পাঠ ২: আয়নায় দেখা ও কাপড় পরিধানের দুয়া ------------------------ ০৫
পাঠ ৩: অসুস্থতা এবং শারীরিক ব্যথার দুয়া ----------------------------- ০৫
পাঠ ৪: আযান ও মসজিদের দুয়া -- ০৫
পাঠ ৫: সওম সংক্রান্ত দুয়া -- ০৫
পাঠ ৬: নতুন চাঁদ দেখার দুয়া--- ০৫
পাঠ ৭: গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী অভিব্যক্তি ------------------------------------ ০৫

কাসাসুল আম্বিয়া (নবীদের জীবনী) -- ০১ - ১০
পাঠ ১: নবী নূহ আ. -- ০৫
পাঠ ২: নবী ইব্রাহীম আ. -- ০৫

সিরাতুন নবী (মুহাম্মদ সা. এর জীবন চরিত) ---------------------------------- ০১ - ১০
পাঠ ১: কুরাইশদের নিষ্ঠুরতা -- ০৫
পাঠ ২ : মিরাজের ঘটনা -- ০৫
পাঠ ৩: মদিনায় হিজরত -- ০৫
পাঠ ৪: ইসলামের বিজয় --- ০৫

হিকায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবনী) --------------------------------------- ০১ - ১০
পাঠ ১: সায়্যেদুনা উমর রা. --- ০৫
পাঠ ২: সায়্যেদাতুনা ফাতিমাহ রা. --------------------------------------- ০৫

আকাইদ (ঈমান ও বিশ্বাস)

শিক্ষক ও অভিভাবক: ঈমানের মূল লক্ষ্য হলো মারিফাত হাসিল করা। আল্লাহকে জানা, বুঝা ও উপলব্ধি করতে পারাই হল মারিফাত। অন্য কথায়, আল্লাহর অস্তিত্ব, তার গুণাবলি ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হওয়াই মারিফাত। যখন একজন ব্যক্তি মনেপ্রাণে আল্লাহকে অনুসন্ধান করতে থাকে এবং এ অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে এসে সে আল্লাহ ছাড়া তার অসহায়ত্ব বুঝতে সক্ষম হয় ঠিক তখনই সে ঈমানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। এটা কোন সহজ বিষয় নয়। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন কেবল তাকেই এ উপলব্ধি দান করেন। আল্লাহ হলেন সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর একমাত্র মালিক। তিনি প্রত্যেককেই তার ভালো কিংবা মন্দ কর্ম অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন কিংবা শাস্তি দেন। কেহই তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে নয়। আল্লাহর ব্যাপারে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারাই, ভালো মানুষ হওয়ার একমাত্র উপায়। এ ধরনের উপলব্ধি একজন মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর এই উপলব্ধি তখন মানুষের সকল চিন্তা, আবেগ এবং অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হলেই, একজন মানুষ পরিপূর্ণ অর্থে আল্লাহ পাকের বান্দা হতে পারে। তখন মানুষের বেঁচে থাকা এবং মরণ সবকিছুই হয় আল্লাহর জন্য। এ ধরনের বিশ্বাসের ফলে একজন মানুষের আচার-আচরণ, তার উঠা-বসা, তার লেনদেন, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে তার সম্পর্কের সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে।

প্রকৃত ঈমানের অধিকারী একজন ব্যক্তি যখন কথা বলে, তখন সে উপলব্ধি করে আল্লাহ তাঁর কথা শুনছেন। যখন সে চলাফেরা করে তখন সে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। এমতাবস্থায় তার প্রতিটি কথা ও প্রতিটি পদক্ষেপে সে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সে তখন কোন মানুষের সাথে এমন কোন আচরণ বা লেনদেন করে না, যার জন্য সে আখেরাতে শাস্তি পেতে পারে।

এ ধরনের বিশ্বাসের ফলে একজন মানুষের গোটা জীবন আখেরাত কেন্দ্রিক পরিচালিত হতে থাকে। সকল বিষয়ে সে প্রথমে দেখে এ বিষয়টি তার আখেরাতের জীবনে কল্যাণকর কিনা? দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধার উপর সে আখেরাতের সুযোগ সুবিধা ও সফলতাকে প্রাধান্য দিতে থাকে।

মানুষ যখন পূর্ণমাত্রায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়, তখন সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাশীল থাকে। আল্লাহর প্রতি এ ধরনের আস্থা এবং নির্ভরশীলতা যখন একজন ব্যক্তির আত্মা এবং হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তখন তার পূর্ণ সত্তাই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার এই পর্যায়ে এসে একজন ব্যক্তি নিজেকে সমাজের অন্য যে কোন ব্যক্তির চাইতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

পাঠ ১
আল-আলিম (সর্বজ্ঞাতা)

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে,

আল্লাহ সবকিছু জানেন, কারণ তিনি সর্বজ্ঞাতা

আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ, সর্বব্যাপী এবং তা সম্পূর্ণ নির্ভুল

আল্লাহর রয়েছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ জ্ঞান

আল্লাহ মানুষকে নিজের জ্ঞানের খুবই সীমিত অংশ দান করছেন

আল্লাহ তার বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে থাকেন

আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী। তার জ্ঞানের কোন সীমা নেই।
আল্লাহ সবকিছু জানেন। কোন কিছুই তার অজানা নয়।
অন্ধকার রাতে একটা পিঁপড়ের চলাফেরা ও তিনি জানেন।
মানুষের কথাবার্তা, এমনকি চোখের ইশারাও তার জানা।
আমাদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়, তাও তিনি জানেন।
মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কোন কিছুই তার অজানা নয়।
আমরা যা অনুভব করি এবং যা অনুভব করি না সবই তিনি জানেন।
আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত।
অতীত ও ভবিষ্যতের সবই তার কাছে বর্তমানের মত সুস্পষ্ট।
মহাকাশে কিংবা সাগরের তলদেশে যা কিছু আছে সবই তার জানা।
আল্লাহর একটি অন্যতম নাম হলো 'আল-আলিম'।
আরবি শব্দ 'আল-আলিম' অর্থ হল 'সর্বজ্ঞ' বা 'সর্বজ্ঞাতা'।
যিনি সবকিছু জানেন তিনিই একমাত্র 'আল-আলিম'।
আল্লাহ তার জ্ঞানের একটি নগণ্য অংশ সৃষ্টিকে দিয়েছেন।
আল্লাহ হলেন সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস।

وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا

*"জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তা তিনিই অবগত।
তাঁর অজ্ঞাতসারে (গাছের) একটি পাতাও পড়ে না।"*
সূরা অনয়াম: ৫৯

অনুশীলনী ১

১। উত্তরের সঠিক অংশটি বৃত্ত দ্বারা আবৃত্ত কর।

ক. আল্লাহর জ্ঞান **সীমাহীন / সীমাবদ্ধ** ।

খ. অন্ধকার রাতে পিঁপড়ের চলাফেরা তিনি **জানেন / জানেন না**।

গ. আমাদের কথাবার্তা ও চোখের ইশারার **অল্প কিছুই / সবকিছুই** তার জানা।

ঘ. আমাদের চিন্তা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার সব কিছুই তার **জানা / অজানা**।

ঙ. অতীত ও ভবিষ্যতের **কিছু কিছু / সব কিছু** তার কাছে বর্তমানের মত পরিষ্কার।

চ. আকাশের উপরের কিম্বা সাগরের তলদেশের **অল্প কিছু / সবই** আল্লাহর জানা।

ছ. আল্লাহর গুণবাচক নাম 'আল-আলিম' শব্দটি **ফার্সি / আরবি**।

জ. আল-আলিম অর্থ হল **'সর্বদ্রষ্টা' / 'সর্বজ্ঞাতা'**।

ঝ. যিনি সবকিছুই জানেন তিনিই একমাত্র **'আল-আলিম' / 'আল-বাসীর'** ।

ঞ. আল্লাহ তার জ্ঞানের **সম্পূর্ণ অংশ / অতি ক্ষুদ্র** অংশ সৃষ্টি জগৎকে দিয়েছেন।

২। প্রথমে নিচের আরবি শব্দটি রং কর। অতঃপর নির্ধারিত স্থানে তার অর্থ লিখ।

الْعَلِيمُ

অর্থ লিখ: ______________________________

৩। নিচের শব্দ বৃত্ত থেকে শব্দগুলো খুঁজে বের করে চিহ্নিত কর।

জ্ঞান	ভবিষ্যত	সর্বজ্ঞাতা	অন্ধকার	তলদেশে	মহাকাশ	কথাবার্তা	ক্ষুদ্র

হাদিসের গল্প
নবী মুসা আ. ও আল্লাহর বান্দা খিদির আ.

একদা আল্লাহ নবী মূসা আ. কে বলেন, তুমি মনে করবে না যে, দুনিয়াতে তুমি সবচেয়ে জ্ঞানী, যদিও তুমি আমার পক্ষ থেকে নবী। আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়েও জ্ঞানী। তার নাম হলো খিদির আ.। তাকে আমি এমন বিশেষ কিছু জ্ঞান দিয়েছি, যা তোমাকে দেইনি। একথা শুনে মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ আমাকে সেই জ্ঞানী লোকের সন্ধান দিন, আমি তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করব। আল্লাহ তাকে কিছু নিদর্শন দিলেন যাতে তিনি খিদির আ. কে খুঁজে পান।

নবী মুসা আ. খিদির আ. কে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে মুসা আ. তাকে দুই নদীর সংযোগ স্থলে খুঁজে পেলেন। তাদের মধ্যে সালাম ও কুশল বিনিময় হলো। অতঃপর নবী মুসা আ. ও খিদির আ. দুজনেই নদীর কিনারা দিয়ে হাঁটছিলেন। তারা নদী পার হতে চাইলেন কিন্তু তাদের কাছে নদী পার হওয়ার কোন নৌকা ছিল না। একটু পরেই তারা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। নৌকার মাঝি লোকদেরকে নদী পারাপার করছিল। মাঝি আল্লাহর বান্দা খিদির আ. কে দেখেই চিনে ফেলল। সে খিদির আ. ও মুসা আ. কে নৌকায় উঠালো। মাঝি বলল, আমি আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসি ও সম্মান করি। তাই আপনাদের কাছ থেকে কোন ভাড়া নেব না। নৌকা নদীতে চলছে। একটি ছোট্ট পাখি নৌকার মাস্তুলে বসলো। পাখিটি নদী থেকে ঠোঁট দিয়ে সামান্য পানি তুলে আবারও মাস্তুলে বসলো। খিদির আ. তখন মুসা আ. কে বললেন, আল্লাহ তোমাকে, আমাকে এবং সকল সৃষ্টিকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা খুবই নগণ্য। ঐ পাখির ঠোঁটের পানি, সাগরের পানির তুলনায় যত অল্প ও নগণ্য, আমাদের জ্ঞান, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় তার চেয়েও বেশি তুচ্ছ, স্বল্প ও নগণ্য।

নৌকা বিপরীত পারে প্রায় ভীড়ে যাচ্ছে। ঠিক তখন, খিদির আ. এক অঘটন ঘটিয়ে দিলেন। খিদির আ. হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করে নৌকাটিকে ফুটো করে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে মুসা আ. অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মুসা আ. রাগত স্বরে বললেন, যে লোকটি আমাদেরকে বিনা পয়সায় নদী পার করে দিচ্ছে, আপনি কিভাবে তার নৌকাটি ফুটো করে দিলেন? এ কেমন কাজ আপনি করলেন? এ কাজটি কি উচিত হল?

আল্লাহর বান্দা খিদির আ. বললেন, আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, তা তোমার নেই। তোমার কাছে এটা মন্দ কাজ হলেও আমার কাছে এটা ভালো কাজ। একথা শুনে মুসা আ. আরো আশ্চর্য হলেন। মুসা আ. বললেন, জনাব, বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে বলবেন কি? জবাবে আল্লাহর বান্দা খিদির আ. বললেন, নৌকার মালিক লোকটি খুবই দরিদ্র। এই নৌকাটাই তার জীবিকার একমাত্র মাধ্যম। যে আল্লাহ ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখেন, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে, এক দুষ্ট রাজা অত্র এলাকার সবগুলো ভালো নৌকা জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে। নৌকাটিকে ফুটো করলে রাজা আর সেটি নিবে না। দুষ্ট রাজা কেবল ত্রুটিমুক্ত নৌকা জবরদখল করছে।

আল্লাহর নির্দেশে আমি নৌকাটি ফুটো করে দিয়েছি। আসলে ঐ নৌকার মালিকের প্রতি এটা আল্লাহর মেহেরবানি।

মুসা আ. তখন উপলব্ধি করলেন, "আল্লাহর জ্ঞানই একমাত্র পরিপূর্ণ। সৃষ্টির কারো কাছে পরিপূর্ণ এবং নির্ভুল জ্ঞান নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। তবে আল্লাহ যদি কাউকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু অবগত করেন, কেবল সেই তা জানতে পারে"।

প্রকৃত সত্য হল, আল্লাহ আমাদেরকে তার সীমাহীন জ্ঞান ভান্ডারের অতি নগণ্য একটি অংশ মাত্র দান করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

'আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।' - সূরা ইসরা: ৮৫

এ গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন,

- *আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা তাঁর নিজের জ্ঞানের তুলনায় খুবই স্বল্প ও নগণ্য*
- *জ্ঞান প্রত্যাশী শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে গিয়ে শিক্ষকের সুবিধামত সময়ে জ্ঞান অর্জন করবে*
- *আল্লাহ সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন। এমনকি ভবিষ্যতে যা কিছু হবে তারও জ্ঞান রাখেন*
- *অনেক সময় এমন কিছু ঘটে, যা সম্পর্কে আমরা আসলে কিছুই বুঝতে পারি না*
- *অনেক ঘটনাকে আমরা মন্দ ভাবি কিন্তু হতে পারে এটা আমাদের জন্য খুবই কল্যাণকর*
- *আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে তার পথনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করব*
- *মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত, তাই মানুষের উচিত নয় জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে অহংকার করা*
- *আল্লাহ তার বিশেষ বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ ধরনের জ্ঞান দান করেছেন, যা অন্যদের নেই*
- *আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে যে জ্ঞান দান তার জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হয় উচিত*

অনুশীলনী ২

১। নিচের ছবিগুলোর আলোকে অপূর্ণ শব্দগুলো লিখে পূর্ণ কর। অতঃপর প্রাপ্ত গোপন শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলো পূর্ণ কর।

	ম	হা	কা	শ
	হা	ত		
বি	জ্ঞা	ন		
	নী	ল		

আল্লাহর জ্ঞানই একমাত্র পরিপূর্ণ এবং নির্ভুল। আমার যা কিছু করি, যা কিছু চিন্তা করি এবং

অনুভব করি তিনি সবকিছুই জানেন, কারণ তিনি হচ্ছেন------------------। আল্লাহ হলেন ------------------, যিনি জানেন অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ----------------- আল্লাহ জানেন যা কিছু আকাশে এবং যা কিছু জমিনে আছে। আল্লাহ তার সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন, কারণ তিনি হলেন -----------------।

২। নিচের খালি স্থানে সূরা আন নাহাল এর ১৯ নম্বর এবং সূরা হুজরাত এর ১৬ নম্বর আয়াতের অর্থ লিখো। (প্রয়োজনে তোমার পিতা-মাতা কিংবা অন্য কারো সহযোগিতা নিতে পারো)

(সূরা আন নাহাল: ১৯)

(সূরা হুজরাত: ১৬)

পাঠ ২
আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

আল্লাহ পাকের অন্যতম গুন হলো আল-বাসীর বা সর্বদ্রষ্টা

আমরা যে স্থানেই লুকিয়ে থাকি না কেন আল্লাহ আমাদেরকে দেখেন

'আল্লাহ সবকিছু দেখছেন' এই বিশ্বাস আমাদেরকে ইসলাম মেনে চলতে প্রেরণা দেয়

যা কিছু আমরা দেখতে পাই না, আল্লাহ তাও স্পষ্টভাবে দেখতে পান

কারো ভালো কাজে ঈর্ষান্বিত না হয়ে বরং সেই ধরনের ভালো কাজ নিজে করা উচিত

আল্লাহ সবকিছু দেখেন। সৃষ্টির সকল কিছু তার দৃষ্টির সম্মুখে।
আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সকল কিছু একই সময়ে দেখেন।
প্রত্যেক মানুষের চলাফেরা তিনি আলাদা ভাবেই দেখেন।
আল্লাহ মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু দেখেন।
মানুষের ভালো ও মন্দ কোন কাজই তার দৃষ্টির বাহিরে নয়।
বিশ্ব জগতের কোন ক্ষুদ্র বস্তু আল্লাহ থেকে গোপন নয়।
অন্ধকার রাতে কালো পিঁপড়ার পথ চলাও আল্লাহ দেখেন।
মাটির নিচে ও সাগরের তলায় যা কিছু আছে সবই তার কাছে পরিষ্কার।
গোটা বিশ্বজগৎ যেন আল্লাহর হাতের তালুতে ও তার দৃষ্টির সম্মুখে।
আল্লাহর অন্যতম নাম হলো 'আল বাসীর' বা 'সর্বদ্রষ্টা'।
বিশ্বের অগণিত সৃষ্টির প্রতিটি গতিবিধি তিনি সদা সর্বদা দেখছেন।

অনুশীলনী ৩

১। উপরের পাঠ থেকে শিক্ষনীয় তিনটি বিষয় নিম্নে লিখ।

২। নিচের আরবি শব্দটি পড়ো এবং রং কর। অতঃপর নির্ধারিত স্থানে তার অর্থ লিখ।

اَلْبَصِيْرُ

অর্থ লিখ --------------

৩। নিচের তালিকা থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ কর।

গোপন	দৃষ্টির	আল-বাসীর	পিঁপড়ার	সময়ে	ক্ষুদ্র	তালুতে	তলদেশে

ক. আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সকল কিছু একই --------- দেখেন।
গ. আমাদের ভালো ও মন্দ কোন কাজই তার --------- বাহিরে নয়।
ঘ. অন্ধকার রাতে কালো --------- পথ চলাও আল্লাহ দেখেন।
ঙ. বিশ্ব জগতের কোন --------- বস্তু আল্লাহ থেকে গোপন নয়।
চ. আল্লাহ দেখেন যা মাটির নিচে ও যা সাগরের ------- আছে।
ছ. গোটা বিশ্বজগৎ যেন আল্লাহর হাতের --------- ও তার দৃষ্টির সম্মুখে।
জ. আল্লাহ হলেন ------------ বা সর্বদ্রষ্টা।

৪। নিচের ডিম্বাকৃতি শব্দ/বাক্যাংশের মধ্যে যেগুলো আল্লাহ পাকের জন্য উপযোগী সেগুলোর উপর ঠিক চিহ্ন দাও।

আল্লাহ দেখেন -----------------

সবকিছু   সবসময়   কেবল ভালো   কেবল আলোতে

যখন আমরা অন্ধকারে   সবখানে   কেবল আমাদের কাজ

আমাদের অন্তর   কেবল জমিনের উপর

ইতিহাসের গল্প
আদর্শ শিক্ষক জুনায়েদ ও তার প্রিয় ছাত্র

অনেকদিন আগের কথা। বাগদাদ শহরে একজন বিখ্যাত শিক্ষক বাস করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামের খাঁটি জ্ঞানে সমৃদ্ধ। শিক্ষাদানে তার জুড়ি ছিল না সেকালে। তার নাম ছিল জুনায়েদ। তার কাছে প্রতিনিয়ত অসংখ্য ছাত্র লেখাপড়া করত। তিনি তার ছাত্রদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তবে একজন ছাত্রকে তিনি ভালবাসতেন অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। বাকি ছাত্ররা জানতো না, কেন জুনায়েদ তাকে এত ভালবাসেন। তাই তারা ঐ ছাত্রের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে গেল। একদা ছাত্ররা অনেকটা অভিযোগের সুরে বলেছিল, 'উস্তাদ ! সে তো আমাদের মতই একজন ছাত্র কিন্তু সে কেন আপনার কাছে এত প্রিয়? জুনায়েদ ছাত্রদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, সে তাদের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, সে অনেক বেশি নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে এবং তার আচার-আচরণ ও সকলের চাইতে উন্নত। এখন তোমরা বুঝতে না পারলেও একদিন তোমরা নিজেরাই তা স্বীকার করবে।

এ উত্তরে ছাত্ররা সন্তুষ্ট হলো না। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে তাই তারা নীরব থাকলো। জুনায়েদ বুঝতে পারলেন, ছাত্ররা তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই তিনি সত্য বিষয়টি বাস্তবে প্রমাণ করে দেখাতে ইচ্ছা করলেন। পরের দিন জুনায়েদ বললেন, 'শোন, ছাত্ররা! আগামীকাল প্রত্যেকে একটি করে মোরগ নিয়ে ক্লাসে আসবে। আমি তোমাদের জন্য মোরগ দিয়ে বিশেষ কিছু একটা করতে চাই'। ছাত্ররা ভারী খুশি। পরের দিন ছাত্ররা একটি করে মোরগ নিয়ে ক্লাসে আসলো। জুনায়েদ ছাত্রদের বললেন, প্রত্যেকে নিজ মোরগ নিয়ে নির্জন স্থানে চলে যাও এবং এমন ভাবে জবাই করো যাতে কেউ দেখতে না পায়। প্রত্যেক ছাত্র শিক্ষকের কথামত গোপনস্থানে গিয়ে মোরগ জবাই করে নিয়ে এলো। কিন্তু শিক্ষকের প্রিয় ছাত্রটি তখনও আসছে না। সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে। অবশেষে সে জীবিত মোরগ নিয়ে শিক্ষকের কাছে ফিরে এলো। তার এ কাণ্ড দেখে অন্যান্য ছাত্ররা হাসাহাসি শুরু করলো। কেউ কেউ তাকে কটাক্ষ করে বললো, তুমি কেন তোমার মোরগটি জবাই করলে না? তুমি কি শিক্ষকের কথা শুনতে পাওনি?

শিক্ষক সকলকে থামতে বললেন। তারপর তিনি তার প্রিয় ছাত্রকে বললেন, কেন তুমি তোমার মোরগটি জবাই করনি? সে বলল, প্রিয় শিক্ষক! আপনি বলেছেন, আমি এমন স্থানে মোরগটি জবাই করব, যেখানে কেউ দেখতে পায় না । আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি কিন্তু এমন স্থান কোথাও পাই নাই, যেখানে কেউ দেখতে পায় না । কারণ আমি যেখানেই মোরগ জবাই করব আল্লাহ তা দেখতে পাবেন। আল্লাহ হচ্ছেন সর্বদ্রষ্টা; তিনি সবকিছু দেখেন। তাই আমি মোরগটি জবাই না করে আপনার কাছে নিয়ে আসলাম। তার উত্তর শুনে সবাই হতবাক। এতক্ষণে তারা বুঝতে পেরেছে, তারা সবাই ভুল। তারা তাদের শিক্ষকের কথামতো মোরগ জবাই করতে পারেনি। তারা জবাই করেছে আল্লাহ পাকের সম্মুখে।

জুনায়েদ এবার ছাত্রদের দিকে মনোনিবেশ করলেন, প্রিয় ছাত্ররা! তোমরা কি এখন বুঝতে পেরেছ, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে জ্ঞানী। আর কেনই বা আমি ঐ জ্ঞানী ছাত্রটিকে বেশি গুরুত্ব দেই? তোমাদের বোধগম্যতা এবং তার বোধগম্যতার মধ্যে পার্থক্য কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? তোমাদের কাছে কি এখন পরিষ্কার হয়েছে, কেন আমি তাকে এত বেশি ভালবাসি?

ছাত্ররা লজ্জায় তাদের মাথা নিচু করল। তারপর বিনয়ের সাথে শিক্ষকের কাছে ক্ষমা চাইল। সেই সাথে তারা আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চাইল। তারা উপলব্ধি করলো, না বুঝে কারো সাথে হিংসা করতে নেই। আর কারো কোন উত্তম গুণাবলি থাকলে সে গুণাবলি অর্জন করাই হচ্ছে উত্তম পন্থা।

এ গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন,

- *আল্লাহ আমাদেরকে দেখতে পান, আমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন*
- *সেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান যে এই উপলব্ধি নিয়ে চলে যে, 'আল্লাহ তাকে সর্বদা দেখছেন'*
- *'আল্লাহ সবকিছু দেখেন' এই উপলব্ধি আমাদেরকে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে সহযোগিতা করে*
- *যে সর্বদা স্মরণে রাখে, আল্লাহ সবকিছু দেখেন, সে আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে না এবং আল্লাহকে মেনে চলতে সচেষ্ট হয়*
- *যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, সে তাদের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ব্যক্তি যারা আল্লাহকে ভুলে যায়*
- *আমরা কখনো কোন ব্যক্তির উন্নত গুণাবলি দেখে হিংসা করব না বরং সে উন্নত গুণাবলি অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব*

অনুশীলনী ৪

১। ছবি দেখে নিচের শব্দগুলো পূর্ণ করো । তারপর কালো দাগ চিহ্নিত লাইনের ভিতরে যে শব্দটি পাওয়া গেল তা দিয়ে নিচের বাক্যগুলো পূরণ কর ।

আ	**স**	মা	ন
প	**র্ব**	ত	
ভা	**দ্র**	মা	স
চে	**ষ্টা**		

আমরা ভালো কিংবা মন্দ যা কিছুই করি, তা সবই আল্লাহ দেখেন। কারণ, তিনি হলেন ------------------ । যেহেতু আল্লাহ -----------------, তাই তিনি এমন সকল কাজ দেখতে পান যা গোপনে করা হয় কিংবা প্রকাশ্যে। আল্লাহর ৯৯ টি সুন্দর সুন্দর গুণাবলি রয়েছে। এসব গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো আল বাসীর । আল বাসীর অর্থ হল --------------------।

ইতিহাসের গল্প
নবী মুসা আ. ও ক্ষুদ্র পোকা

নবী মুসা আ. রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। হাঁটছিলেন আর চিন্তা করছিলেন, কিভাবে আল্লাহ সকল সৃষ্টির দেখাশোনা করেন? তার সৃষ্টি জগতে কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে। এসব সৃষ্টির প্রতি মুহূর্তে কত হাজার হাজার প্রয়োজন। কিভাবে আল্লাহ একই সাথে এত সৃষ্টির প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছেন। কিভাবেই বা তিনি সকল সৃষ্টিকে একসাথে দেখছেন, তাদের আবদার শুনছেন আর কিভাবে তিনি তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করে যাচ্ছেন? তিনি মনের অজান্তেই বলতে লাগলেন, আল্লাহ আপনি কি আমাকে দেখাবেন, কিভাবে আপনি একই সাথে সকল সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণ করেন?

নবী মুসা আ. যখন এই চিন্তা করছিলেন তখন তিনি তার সম্মুখে, রাস্তার মধ্যখানে মাটির একটি ঢিলা দেখতে পেলেন। এ ধরনের কতই না ঢিলা রাস্তায় পড়ে থাকে, কেউ তো কখনো এগুলোর দিকে খেয়াল করে না।

আল্লাহ মূসা আ. এর প্রতি নির্দেশ জারি করলেন, তোমার সম্মুখে পড়ে থাকা ঢিলাটি হাতে নাও। তারপর ঢিলাটিকে ভেঙে দাও। মুসা আ. ঢিলাটি হাতে নিয়ে তা ভাঙতে থাকলেন কিন্তু তার মনে চিন্তা আসলো কেন আল্লাহ ঢিলাটি আমাকে ভাঙতে বললেন?

কিন্তু কি আশ্চর্য? ঢিলাটি ভাঙ্গার সাথে সাথেই তিনি দেখতে পেলেন, কিছু একটা যেন এখান থেকে বের হয়ে আসছে। তিনি আশ্চর্য হলেন । ঢিলাটির ঠিক মধ্যভাগে খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির একটি পোকা দেখতে পেলেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সে পোকাটি একটি সবুজ গাছের পাতা খুব ক্ষুদ্র দাঁত দিয়ে কেটে খাচ্ছে।

মুসা আ. যখন আশ্চর্য হয়ে সে দৃশ্য দেখছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই পোকাটির আওয়াজ শুনতে পেলেন। পোকাটি মনের আনন্দে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছিল এই বলে, ‘সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে দেখেন এবং জানেন, আমি কোথায় অবস্থান করছি আর তিনি আমাকে খাওয়ান কখনো আমাকে ভুলে যান না’।

মুসা আ. এর মনের গহীন থেকে তখন বের হয়ে এলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার সকল সৃষ্টিকে দেখেন তা যেখানে যে অবস্থায়-ই থাকুক, কোন কিছুই তার কাছে গোপন নয়।

অনুশীলনী ৫

১। তোমার শিক্ষক কিংবা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে এই গল্প থেকে কমপক্ষে তিনটি শিক্ষা চিহ্নিত কর।

পাঠ ৩
ঈমানের সাতটি বিষয়

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

ঈমানের মৌলিক বিষয় হলো সাতটি

নিজ ইচ্ছামতো ভাল কাজ করাই আখরাতে মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ইসলাম অনুসরণই আল্লাহর রাগ বাঁচার একমাত্র উপায়

অবিশ্বাসীরা পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণ করে আর ঈমানদারগণ কেবল নবীদের অনুসরণ করে

আল্লাহ কখনো এমন ব্যক্তিকে মাফ করেন না যে অবিশ্বাসী হয়ে মারা যান

আল্লাহর ভালবাসা কেবল সেই পাবে, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও তার সাথে কাউকে শরিক করে না

অবিশ্বাসীরা অনন্তকাল জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ হবে

অনেক অমুসলিম ইসলামকে সত্য জেনেও দুনিয়ার লোভ ও বন্ধু-বান্ধবের প্রভাবে তা গ্রহণ করে না

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। মুসলমান হিসেবে আমাদের মৌলিক বিশ্বাস সাতটি। এর কোন একটিকে অবিশ্বাস করলে কেউ মুসলমান থাকে না বরং কাফের বা অবিশ্বাসী হয়ে যায়। এই বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে অবশ্যই জানতে হবে। এ গুলোকে মুখে উচ্চারণ করার পাশাপাশি অন্তর দিয়ে তা মেনে নিতে হবে। ঈমানের বিষয়গুলো ঈমান আল-মুফাসসালে উল্লেখ আছে। তাহলে চলো ঈমান আল- মুফাসসাল কে প্রথমে আরবিতে এবং তারপর বাংলায় শিখে নেই।

ঈমান আল- মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ

অর্থ: *আমি ঈমান এনেছি, আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতা সমূহের প্রতি, তার কিতাব সমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, তাকদীরের প্রতি; যার ভালো ও মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।*

ঈমানে মুফাসসালে উল্লেখিত ঈমানের বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ: মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ এক, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের লালন পালন করেন। আল্লাহর কোন শরীক বা অংশীদার নেই আর তার মতো অন্য কিছুই নয়। আমাদেরকে একমাত্র তারই এবাদত করতে হবে, তার নির্দেশিত পথে চলতে হবে।

২. ফেরেশতা: আমরা বিশ্বাস করি যে, ফেরেশতারা হচ্ছেন আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। আল্লাহ তাদেরকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লার ইবাদত এবং তার নির্দেশনা মেনে চলাই তাদের কাজ। তাদের খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হন না। তাদের সংখ্যা কত তা কেবল আল্লাহই জানেন।

৩. কিতাব: আল্লাহ মানুষের হেদায়েতের জন্য অনেকগুলো কিতাব নাজিল করেছেন। এসব কিতাব ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ নবীদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা এগুলোকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করি। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ কিতাব হল কোরআন। কোরআনের পূর্বে নাজিলকৃত সবগুলো কিতাবই কোন না কোন ভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু অংশ হারিয়ে গিয়েছে, কিছু কিছু অংশে লোকেরা নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। একমাত্র কোরআনই এখন নির্ভুল আল্লাহর কিতাব। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশনা পেতে হলে কোরআনকেই অনুসরণ করতে হবে।

৪. রাসূলগণ: নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস আমাদের ঈমানের অন্যতম অংশ। কোন একজন নবী ও রাসূলকে অবিশ্বাস করলে ঈমানদার থাকা যায় না। নবীরা হচ্ছেন সর্বোত্তম মানব এবং তারা আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত। আল্লাহ প্রত্যেক জাতির প্রতি কোনো না কোনো নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৫. শেষ দিন: মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, একদিন আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন আল্লাহ সবকিছুকে আবার নতুন জীবন দান করবেন। কেয়ামতের মাঠে তাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার জন্য সকলকে উপস্থিত করবেন। সে দিনটি হবে ৫০হাজার বছরের সমান। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ আমাদের বিশ্বাস, কর্ম এবং আচার-আচরণের ভিত্তিতে আমাদেরকে বিচার করবেন। আল্লাহ সেদিন ভালো লোকদের পুরস্কৃত করবেন আর মন্দ লোকদের তিনি শাস্তি দেবেন।

৬. তাকদীর: মুসলিম হিসেবে আমরা আমাদের তাকদির বা ভাগ্য লিপির উপর বিশ্বাস করি। আমাদের ভাগ্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই আমাদের জীবনে ঘটে না। আমাদের জীবনে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে আসে। তবে আমাদের দায়িত্ব হলো ভালো কাজ কর ও মন্দ কাজ পরিহার করা।

৭. পুনরুত্থান: মৃত্যুর পর নতুন করে জীবন লাভকে পুনরুত্থান বলা হয়। সে জীবন হবে অনন্ত কালের যা কখনো আর শেষ হবে না। সে জীবনে ঈমানদাররা চিরস্থায়ী জান্নাতে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে। আর অবিশ্বাসীরা জাহান্নামে আজীবন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

আর কিয়ামতের (শেষ দিনের) আগে যারা মারা যাবে তারা কবরে আরো বহু বছর অবস্থান করবে। করবে আমাদের দেহ মৃত হলেও আমাদের আত্মা জীবিত থাকবে। কবরের জীবন হয়তো জান্নাতের একটি সুন্দর বাগান হবে, না হয় জাহান্নামের একটি ভয়ংকর গর্ত হবে।

উপরে আলোচিত সবগুলো বিষয়কে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেই একজনকে মুসলিম হতে হয়। কোন ব্যক্তি যদি ঈমানের সাতটি বিষয়ের কোন একটিকে অস্বীকার করে তবে তাকে মুসলিম গণ্য করা যাবে না। সে অবিশ্বাসী বা কাফের হিসেবে গণ্য হবে।

অনুশীলনী ৬

১। নিচের আরবি শব্দগুলোকে লাইন টেনে বাংলা অর্থের সাথে মিলাও।

আল্লাহ	مَلَائِكَة
শেষ দিন	اَلْبَعْث
ফেরেশতা	الله
পুনরুত্থান	اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ
রাসূলগণ	اَلْقَدْرِ
কদর	كُتُب
কিতাবসমূহ	رُسُل

২। নিচের প্রতিটি ঘরে চারটি করে শব্দ দেয়া আছে। প্রত্যেক ঘরেই তিনটি শব্দ পরস্পর সম্পর্কিত আর একটি ভিন্ন। ভিন্ন শব্দটি বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত কর।

ঈমান	বিশ্বাস	কুফর	সত্যায়ন
আল্লাহ	অংশীদার	এক	স্রষ্টা
গুনাহ	ফেরেশতা	আলো	অনুগত
কিতাব	মূর্তি	কোরআন	নাযিলকৃত
মুহাম্মদ	নবী	শ্রেষ্ঠ	দুষ্ট
শেষ দিবস	বিচার দিবস	দীর্ঘ	অবিচার
আল্লাহ	কদর	দুর্ঘটনা	নিয়ন্ত্রণ
চিরস্থায়ী	জান্নাত	জীবিত	কিছুই না

ইতিহাসের গল্প
আবু তালেবের মৃত্যু ও ঈমান

আবু তালেব ছিলেন কুরাইশদের সরদার। তিনি ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা. এর আপন ও প্রিয়তম চাচা। আবু তালিব ছিলেন প্রকৃতই একজন ভালো মানুষ। মক্কার কুরাইশরা ছিল নবী মুহাম্মদ সা. ও ইসলামের দুশমন। কিন্তু আবু তালেব সর্বদা নবী মুহাম্মদ সা. এর পক্ষেই ছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বৎসর তিনি নবী মুহাম্মদ সা. কে চোখে চোখে রেখেছেন। তিনি কখনো তার কোন ক্ষতি হতে দেননি, যদিও তিনি মুসলিম ছিলেন না। ইসলামের পক্ষে অবস্থান নেয়ায় অনেক কঠিন বিপদে তাকে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো নবী মুহাম্মদ সা. কে একা ছেড়ে যাননি।

নবী মুহাম্মদ সা. আবু তালেবকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি চাইতেন, আবু তালেব যেন মুসলিম হয়ে যান। তিনি সুযোগ পেলেই বলতেন, 'প্রিয় চাচা! শুধু ঘোষণা করুন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' তবেই আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। কিন্তু আবু তালেব মুচকি হেসে বলতেন, 'আমি কখনো আমার পূর্বপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করব না'। তাই আবু তালেব আজীবন মূর্তিপূজাই করেছেন, যেমনটি তিনি তার পূর্ব পুরুষদের করতে দেখেছেন।

হঠাৎ একদিন আবু তালেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর তিনি এখন মৃত্যুশয্যায়। খবর শুনে নবী মুহাম্মদ সা. দ্রুত তার ঘরে এলেন। সাধারণত তার সাথে সাক্ষাৎ হলেই তিনি মুচকি হেসে কুশল বিনিময় করতেন। কিন্তু আজকে তা সম্ভব হচ্ছে না। নবী দেখতে পেলেন, একটি লম্বা শরীর বিছানায় পড়ে আছে। তার চোখে অশ্রু চলে এলো। তিনি হাটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়লেন। আলতো করে তার হাতটি জড়িয়ে ধরলেন। সে সময়ে ইসলামের প্রধান শত্রু আবু জেহেল সহ কয়েকজন কুরাইশ নেতা সেখানে উপস্থিত ছিল।

নবী মুহাম্মদ সা. চাচার হাত ধরে পাশে বসে আছেন। এটা দেখে আবু জেহেল চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করল। নবী আবু জেহেলকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি প্রিয় চাচার শেষ মুহূর্তকে সফল করতে পেরেশান। নবী বলতে লাগলেন, প্রিয় চাচা! শুধু একবার বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) -তাহলে আল্লাহ আপনাকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। ওদিকে আবু জেহেল বলতে লাগলো, আবু তালেব তুমি কি মৃত্যুর আগে কাপুরুষের মত তোমার পিতার ধর্ম পরিত্যাগ করতে চাও? তুমি কি মৃত্যুকে এতই ভয় পাও?

আবু তালেবের দুর্বল চক্ষু আরো একবার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ সা. এর উপর ঘুরে এলো। নবী আবারও তাকে ঈমান আনতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বিপরীতে আবু জেহেল আগের মতই তাকে বারণ করল। এভাবে যতবারই নবী তাকে ঈমান আনতে বলছিলেন, আবু জেহেল বলছিল, তুমি কি মৃত্যু ভয়ে মৃত্যুর আগে তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করবে? আবু জেহেল জানতো, যদি কুরাইশ সরদার মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে এর প্রভাব গোটা কুরাইশদের উপর পড়বে এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। তাই সে আবু তালেবের ঈমান গ্রহণে বার বার বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

অবশেষে আবু তালেব নরম স্বরে বললেন, আমি এটা জানি যে, মুহাম্মাদের ধর্ম সকল ধর্মের চেয়ে উত্তম। কিন্তু আমি আমার পিতা আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই থেকে গেলাম। একথা বলেই আবু তালেব তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তার আর ইসলাম গ্রহণ করা হলো না।

নবীর দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, প্রিয় চাচা আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো, যতক্ষণ না তিনি আমাকে নিষেধ করেন। এর কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ নাযিল করলেন, "নবী ও মু'মিনদের জন্য শোভনীয় নয়, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে স্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।"-সূরা তাওবা: ১১৩

আবু তালেব এর ছোট ভাই আব্বাস রা. পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদা বলেছিলেন, হে মুহাম্মদ সা.! তুমি তোমার প্রিয় চাচাকে কোন সাহায্য করতে পারো নাই, যদিও তিনি সর্বদা তোমার পাশে ছিলেন। নবী মুহাম্মদ সা. তখন বললেন, হে আমার চাচা আব্বাস, আপনি জেনে রাখুন, আমার কারণেই আবু তালেব জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি। তাকে একটি আগুনের জুতো পড়ানো হবে । আল্লাহ তার সবকিছু মাফ করে দিয়েছেন কেবল অবিশ্বাস ব্যতীত। নবীজির আদরের চাচা হওয়া সত্ত্বেও আবু তালেব জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পান নাই। একমাত্র এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণই একজন লোককে আল্লাহর রাগ এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

এ গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন,

- *অবিশ্বাসীরাও অনেক সময় অনেক ভালো গুণের অধিকারী হয় এবং তারা সমাজে ভালো ভূমিকা রাখে*
- *একজন অবিশ্বাসী অনেক সময় একজন বিশ্বাসী মুসলিমের ভালো বন্ধু এবং সমর্থক হতে পার*
- *কেবল ভালো কাজ দ্বারাই একজন আখেরাতে মুক্তি পেতে পারে না*
- *এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে নেয়াতেই মুক্তি নিহিত*
- *নবীদের সবচেয়ে বড় কামনা ছিল, লোকেরা যেন জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায় এবং জান্নাতের অধিকারী হয়*
- *অবিশ্বাসীরা অন্ধভাবে পূর্ব পুরুষের অনুসরণ করে, তারা তাদের বিবেক কে কাজে লাগায় না*
- *একজন মুসলিম কেবলমাত্র নবীদের দেখানো পথই অনুসরণ করে*
- *একজন প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি মানুষের পরকালীন মুক্তি নিয়েই কেবল চিন্তিত থাকে*
- *আমার সর্বদা সর্বোত্তম ভাবে চেষ্টা করব লোকদেরকে ইসলামে নিয়ে আসতে এমনকি তাদের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত*
- *লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে কখনো আমরা হতাশ হবো না*
- *অবিশ্বাসীরা এটা ভয় করে যে, যদি ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় তাহলে তাদের ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা হারিয়ে যাবে*
- *সচেতন অবিশ্বাসীরা ইসলামের সত্যতা বিশ্বাস করা সত্বেও অন্য কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করে না*
- *ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণকারী কোন ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা যাবে না*
- *আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনো মাফ করেন না যে অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়*
- *জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নতম শাস্তি হলো আগুনের জুতা পড়ানো যার উত্তাপে মগজ পর্যন্ত টগবগ করবে*
- *অবিশ্বাসীরা অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের শাস্তি পেতে থাকবে*
- *গুনাহগার ঈমানদার ব্যক্তি তাওবা ছাড়া মারা গেলে জাহান্নামে যাবে, অবশ্য শাস্তি ভোগের পর সে জান্নাতে যাবে*
- *আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস এবং ইসলামকে গ্রহণই একজন লোককে আল্লাহর রাগ এবং শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে*

অনুশীলনী ৭

১। ছবি ব্যবহার করে গোপন শব্দটি বের কর। অতঃপর তা দিয়ে নিচের বাক্যগুলো পূর্ণ কর।

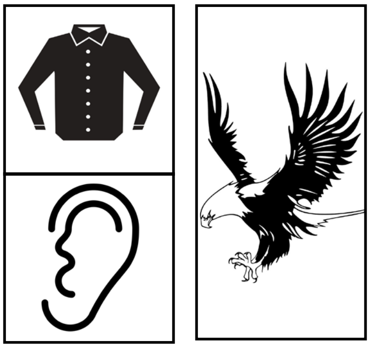

		গ	ল
জা			
কা			

পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণ ও দুনিয়ার লোভ ও ভালোবাসা -------- গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। আবু তালেবের ঈমান না আনার কারণ ছিল পর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ ও দুনিয়ার সম্মানের মোহ। যে হৃদয়ে পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুসরণের রোগ রয়েছে কিংবা যে অন্তর দুনিয়ার ভালোবাসায় পূর্ণ তাতে ------- প্রবেশ করেন না। এমন হৃদয়ে --------- জাগ্রত করতে হলে প্রথমেই হৃদয় থেকে দুনিয়ার মোহ ও অন্ধ অনুকরণের রোগ উপড়ে ফেলতে হবে। বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলি। মনে কর, আমরা একটি আমের চারা রোপণ করব এবং আমাদের একখণ্ড জমিও আছে। কিন্তু সেখানে প্রচুর আগাছা লেগে আছে। তাহলে কী করতে হবে? প্রথমে জমি থেকে আগাছা দূর করতে হবে এবং জমিকে চারা রোপণের উপযোগী করতে হবে। জমিকে আগাছামুক্ত এবং রোপণ উপযোগী না করে যদি তাতে আমের চারা রোপণ করি, তাহলে চারাটি আগাছার দাপটে অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তা থেকে কোন ফল পাওয়ার সুযোগ নেই।

আমাদের অন্তর হলো ঐ জমির মতো। আর অবিশ্বাস, মিথ্যা উপাস্য ও সন্দেহ হলো আগাছা। আর --------- হলো আমের চারা তুল্য। অন্তর যদি অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে কিংবা সেখানে অনেক মিথ্যা উপাস্যের ভালোবাসা অবস্থান করে, তাহলে সে অন্তরে --------------- নামক চারা কিভাবে গজাবে? তাই অন্তর থেকে দুনিয়ার লোভ ও মিথ্যা উপাস্যের ভালোবাসা তথা আগাছা প্রথমে সরাতে হবে। অতঃপর যদি আগাছামুক্ত অন্তরে ---------- নামক চারা রোপণ করি তাহলে তা থেকে ফল পাবো। আমাদের আমল আখলাক সুন্দর হবে। নেক আমল হল গাছের ফলেরই ন্যায় যা বিশ্বাসের গাছ থেকেই উৎপাদিত হয়।

২। সংক্ষেপে নিচের বিশ্বাসগুলোর বর্ণনা দাও।

আল্লাহ

ফেরেশতাগণ

কিতাবসমূহ

নবীগণ

শেষ দিন

কদর

পুনরুত্থান

৩। নিচের শব্দ ধাঁধা থেকে প্রদত্ত শব্দগুলো খুঁজে বের কর।

ঈমান ফেরেশতা আলো কিতাব রাসুল কদর মৃত্যু জান্নাত জাহান্নাম

কি	রা	ক	আ	ফে	সু	দ	রা
জা	মৃ	লো	ত্যু	রে	ন্না	র	সু
তা	ঈ	মা	ন	শ	হা	আ	ল
ত্যু	হা	জা	ন্না	তা	ন্না	লো	ন্না
ব	কি	হা	আ	হা	ম	ক	জা
মৃ	তা	সু	হা	জা	সু	দ	হা
জা	ব	ন্না	মৃ	আ	ন্না	র	ন্না
তা	হা	ম	ত্যু	ক	আ	ত	ম

আখলাক

শিক্ষক ও অভিভাবক: উন্নত নৈতিক চরিত্র হলো ব্যক্তিগত ধার্মিকতার মূল বিষয় যা প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়টিকে নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলে। উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী একজন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত অন্যের সাথে তার আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিকতার সীমা মেনে চলে।

ইসলামী নীতি-নৈতিকতার অন্তর্নিহিত রহস্য কোথায় নিহিত? একটি হাদিস অনুসারে তা হল এই, 'আপনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন অন্যের জন্য তাই পছন্দ করবেন'। তার মানে হলো, অন্যরা আপনার সাথে যেমন আচরণ করা আপনি ভালোবাসেন আপনি অন্যের সাথে তেমন আচরণ করবেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি পছন্দ করে উত্তম শব্দ দ্বারা সম্মোধিত হতে এবং উত্তম আচরণ পেতে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত অন্যের সাথে সুন্দর করে কথা বলা। আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসি কেউ আমাদের জন্য সমস্যার কোন কারণ না হোক। তাই আমরাও অন্য কারো জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করব না। প্রত্যেকে চায় অন্যরা তার প্রতি সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করুক। তাই আমরাও যেন অন্যের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হই এবং সহযোগী হই।

নৈতিকতার এই মানদন্ড খুবই সাধারণ এবং প্রাকৃতিক। এটি এতই সহজ যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তা সহজে অনুসরণ করে চলতে পারে। হাদিসের এই কথাটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সুস্থ সবল কিংবা শারীরিক বিকলাঙ্গ সকলের জন্যই বুঝা অতি সহজ । চাই কেউ তা পছন্দ করুক কিংবা না করুক, তা বুঝতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এভাবেই ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স) কে আচরণ উন্নয়নের একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আরেকটি বিষয় হলো আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কে ছাত্র কিংবা কে শিক্ষক, কে পীর কিংবা কে মুরিদ এটা ধর্তব্য বিষয় নয়। বরং আচরণ সকলেরই উন্নত হওয়া উচিত । একজন শিক্ষক যেমন তার ছাত্রের কাছে উন্নত আচরণ আশা করেন, তেমনি একজন শিক্ষকের উচিত তার ছাত্রদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

অন্য একটি হাদিসে, রাসূলে কারীম সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে উত্তম যার নৈতিক চরিত্র অর্থাৎ আচার-আচরণ ও লোকদের সাথে লেনদেন উন্নত। একজন উত্তম মানুষ হওয়ার জন্য শুধু এই সূত্রটি অনুসরণ করলেই হয় যে, নীতির ক্ষেত্রে দ্বি-মুখিতা অবলম্বন করা যাবে না। এই নীতিমালা অনুসরণ করে যে তার আচার আচরণকে উন্নত করে সেই হচ্ছে উন্নত চরিত্রের জন্য একটি আদর্শ নমুনা।

পাঠ ১
নিজের প্রতি সম্মান

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

নিজেকে সম্মান করার ইসলামী শিক্ষাগুলো কী কী

নিজেকে সম্মান করা বলতে নিজের আত্মা, চিন্তাশক্তি এবং শরীরকে সম্মান করা বুঝায়

মানুষের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো, সে তার ব্যক্তিত্ব এবং সম্মান নিজেই রক্ষা করবে

যে ব্যক্তি তার নিজেকে সম্মান করে না, কেয়ামতে আল্লাহ তাকে শাস্তির মুখোমুখি করবেন

কঠোর পরিশ্রম করা এবং নিজ উদ্যোগে কোন কাজ শুরু করা ব্যক্তির জন্য সম্মানের বিষয়

অহংকার থেকে বাঁচার উপায় হলো, নিজের কাজ নিজে করা ও পরনির্ভরশীল না হওয়া

মুসলিম সর্বদা নিজ উদ্যোগে কাজ করবে, অলসের মতো অন্যের অপেক্ষায় বসে থাকবে না

আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল মানুষের স্রষ্টা। তিনি আমাকে করছেন সৃষ্টির সেরা মানুষ। আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন একটি পবিত্র আত্মা। আমাকে সুন্দর দেহ ও সুস্বাস্থের অধিকারী করেছেন। দিয়েছেন বিস্ময়কর চিন্তা ও মেধা শক্তি। আমার সময়, স্বাস্থ্য ও সম্পদ আল্লাহর দেয়া নিয়ামত। কেয়ামতে তিনি আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন নিজেদের সম্মান করে ও যত্ন নেয়। নিম্নের কাজগুলো করার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ নিজেকে সম্মান করতে পারে:

- মন ও আত্মাকে পবিত্র রাখার জন্য মন্দ কাজ ও গুনাহ থেকে বিরত থাকা
- শরীরের যত্ন নেয়া, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও শারীরিক পরিশ্রম করা
- শিক্ষার মাধ্যমে মেধা, মনন ও চিন্তার বিকাশ ও উৎকর্ষতা সাধন করা
- সময়, সম্পদ এবং স্বাস্থ্য কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো ও বিকাশ সাধন করা
- দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর সকল কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা
- অন্যের সাথে সম্মান রক্ষা করে কথা বলা ও উত্তম আচরণ করা

আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা নিজেদেরকে সম্মান করে। আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে নিজেকে সম্মান করতে শিখো।

অনুশীলনী ৮

১। নিচের বাক্যটি রং করো এবং তা তিনবার লিখো।

আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন
যারা নিজেদেরকে সম্মান করে।

২। নিচের তালিকাটি ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ কর।

কেয়ামতে চিন্তার গুনাহ সম্মান সম্পদ সম্মান মেধা

ক. আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন একটি পবিত্র আত্মা যা --------- থেকে মুক্ত।

খ. আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন সুন্দর দেহ এবং বিস্ময়কর চিন্তা ও -------- শক্তি।

গ. আল্লাহ আমাকে সময়, স্বাস্থ্য এবং ------ দিয়ে ধন্য করেছেন।

ঘ. আল্লাহ তার নিয়ামতগুলো সম্পর্কে আমাকে ------- জিজ্ঞেস করবেন।

ঙ. আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন নিজেকে -------- করি।

চ. আমি নিজেকে সম্মান করতে পারি মেধা, মনন ও -------- বিকাশ সাধন করে।

ছ. আমি নিজেকে সম্মান করতে পারি অন্যের সাথে ------ রক্ষা করে কথা বলা মাধ্যমে।

শিক্ষক ও অভিভাবক নিচের বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন

- *নিজেকে সম্মান করা মানে নিজের আত্মা, নিজের চিন্তা, নিজের শরীর এবং ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা*
- *আমি আল্লাহর এবাদতে তার নির্দেশিকা অনুসরণ এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমার আত্মাকে যত্ন করতে পারি*
- *আমি নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, শরীর চর্চা, পরিমিত বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে আমার শরীরকে যত্ন করতে পারি*
- *উন্নত আচার-আচরণ এবং উন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে আমি আমার ব্যক্তিত্বের যত্ন নিতে পারি*

ইতিহাসের গল্প

ভিখারি ব্যক্তি ও মহানবী সা. এর সাহায্য

মদিনার এক দরিদ্র ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ সা. এর কাছে এসে তার অভাব পেশ করলো। লোকটি বললো, আমার আয় রোজগারের কোন ব্যবস্তা নেই। সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব। আমরা না খেয়ে আছি। আমাকে সাহায্য করুন;ভিক্ষা দিন। মহানবী সা. সাধারণত কোন সাহায্য প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। একইভাবে তিনি লোকদের ভিক্ষা করাও পছন্দ করতেন না। তিনি লোকদের নিজ হাতে কাজ করে সংসার চালাতে উৎসাহ দিতেন। নিশ্চই ভাবছো, তাহলে নবী মুহাম্মদ সা. এ ভিখারি লোকটিকে কী বললেন। হ্যাঁ, লোকটির জন্য তিনি অতি চমৎকার এক উদ্যোগ নিলেন। তিনি লোকটিকে বললেন, তোমার ঘরে কি এমন কিছু আছে যা বিক্রি করা যায়? লোকটি বলল হ্যাঁ, আমার একটি কম্বল আছে যা আমি কখনো গায়ে জড়িয়ে ঘুমাই কখনো বা নিচে দেই। আর হ্যাঁ, আমার একটি বাটিও আছে, যা দিয়ে আমরা পানি পান করি।

“এগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো” নবী মুহাম্মদ সা. লোকটিকে বললেন। লোকটি তা নিয়ে এলে নবীজি তার সাহাবীদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি এগুলো কিনবে? এক সাহাবী বললেন, আমি এগুলোকে একটি রূপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কিনতে পারি। আরেকজন সাহাবী বললেন, আমি তার জন্য দুটি রূপ্য মুদ্রা দিতে পারব। অতঃপর নবী মুহাম্মদ সা. দুটি রূপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিলেন। লোকটির হাতে তা তুলে দিয়ে বললেন, এর একটি দিয়ে তুমি তোমার পরিবারের জন্য আজকের খাবার কিনবে এবং আরো একটি দিয়ে তুমি একটি কুড়াল কিনে তা আমার কাছে নিয়ে আসবে। লোকটি একটি কুড়াল কিনে নবীজির কাছে চলে এলো। নবী মুহাম্মদ সা. নিজ হাতে সেই কুড়ালটির হাতল লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, যাও জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করো। তারপর তা বাজারে বিক্রি করে তা দিয়ে তোমার পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে থাকো । আর শুনো, দুই সপ্তাহ পরে তুমি আমার কাছে আসবে। নবীজির কথামতো লোকটি নিজ কাজে বেরিয়ে পড়লো। আর সত্যি কথা হল সাহাবীরা নবীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তার কথাগুলো তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এভাবে লোকটি কুড়াল নিয়ে প্রতিদিন জঙ্গলে যেত কাঠ সংগ্রহ করতে। তারপর তা বাজারে বিক্রি করতো আর সেই টাকা সুখেই তার সংসার চালাচ্ছিল। সেখান থেকে বেঁচে যাওয়া কিছু টাকা দিয়ে সে তার ও তার পরিবারের জন্য নতুন কাপড়-চোপড়ও কিনে নিলো।

দু’সপ্তাহ পর লোকটি নবীজির কাছে ফিরে এসে তার অবস্থার উন্নতির কথা জানালো। সে বললো, সে এখন সুখেই দিন কাটাচ্ছে। তার আর ভিক্ষা করতে হয় না। নবীজি তার কথা শুনে ও অবস্থা দেখে মুচকি হাসলেন। আর তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছ, নবীজির মুচকি হাসি কেমন সুন্দর হবে, তাইনা? তিনি যখন মুচকি হাসি দিতেন, মনে হতো যেমন আসমান এবং জমিন দুটাই তার হাসিতে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

নবীজি এতে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। কারণ লোকটিকে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। সে এখন নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে নিজ হাতে উপার্জন করে দিন রুজি চালাচ্ছে। ভিক্ষাবৃত্তি করার চাইতে নিজ হাতে পরিশ্রম করে খাওয়া কতই না উত্তম!

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ মানুষকে সম্মান দিয়েছেন। তাই কেউ অবহেলা বা গাফলতির মাধ্যমে নিজের সম্মান নষ্ট করুক তা নবী মুহাম্মদ সা. কখনো চাইতেন না। নবীজি তখন লোকটিকে সম্মোধন করে বললেন, ভিক্ষা করে নিজেকে লাঞ্ছিত করার চাইতে এটা অনেক উত্তম কাজ।

নবী মুহাম্মদ সা. অন্য হাদিসে বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি সকালে উঠে লাকড়ি বহন করে উপার্জন করা ও তা থেকে সদকা করা এবং নিজ কাজে ব্যয় করা অধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি থেকে, যে ভিক্ষা করে, কখনও ভিক্ষা করে কিছু পায়, কখনও পায় না।' (মুসলিম) অন্য আরেক হাদিসে নবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে এই নিশ্চয়তা দেবে যে, সে কারো কাছে ভিক্ষা চাইবে না, তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো"। (আবু দাউদ)

এ গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন,

- *পরিশ্রম করে খাওয়া সম্মানের আর ভিক্ষাবৃত্তি অসম্মানের কাজ*
- *নিজ হাতে কাজ করা কখনো অসম্মানের নয়*
- *নিয়মিত পরিশ্রম করা সফলতার অন্যতম উপায়*
- *আমাদের নিজেদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব*
- *মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত*
- *যে নিজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না আখেরাতে সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে*
- *কেউ কোন সাহায্যের আবেদন করলে যথা সম্ভব তাকে সাহায্য করা উচিত*
- *'আত্মসন্মান কিভাবে রক্ষা করতে হয়, তা কাউকে শিক্ষা দেয়া' হলো সর্বোত্তম শিক্ষা*
- *ভিক্ষাবৃত্তিকে কখনো উৎসাহিত করা উচিত নয়*
- *তোমার যা আছে তা নিয়েই তোমার উপার্জনে লেগে যাওয়া উচিত*
- *মুসলিম সব সময় নতুন কিছুর উদ্যোগ গ্রহণ করে, অলসের মতো বসে অপেক্ষা করে না*
- *পুরুষ ব্যক্তির দায়িত্ব হল তার পরিবারের ভরণ পোষণ করা*
- *একজন মুসলমানের সব সময় আগ্রহ ভরে নবীর নির্দেশনা মেনে চলা উচিত*
- *নবীর প্রতি আনুগত্য তার প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত লক্ষণ*
- *লোকদেরকে উপদেশ দিতে হবে ভদ্রভাবে, কর্কস বা বদমেজাজি হয়ে নয়*
- *মুহাম্মদ সা. বলেছেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চাইতে উত্তম কোন কিছু কেউ ভক্ষণ করে না"*

অনুশীলনী ৯

১। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর। উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দাও।

সত্য	মিথ্যা	
☐	☐	ক. আমার স্বাস্থ্য ও সম্পদ আমার নিজের অর্জন।
☐	☐	খ. আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন নিজেকে সম্মান করতে।
☐	☐	গ. আত্মাকে পবিত্র রাখতে হলে গুনাহ পরিত্যাগ করতে হবে।
☐	☐	ঘ. শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে শারীরিক পরিশ্রম করা যাবে না।

☐ ☐ ঙ. শিক্ষার মাধ্যমে মেধা, মনন ও চিন্তার বিকাশ সাধন করা যায়।

☐ ☐ চ. মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা নিজেকে সম্মান করা নয়।

☐ ☐ ছ. আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে নিজেকে সম্মান করতে হবে।

☐ ☐ জ. ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের সম্মান বিনষ্ট করে ও মর্যাদা কমায়।

☐ ☐ ঝ. বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাকারী কিয়ামতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

২। নিচের ওলটপালট শব্দগুলোকে সঠিকভাবে লিখে অর্থপূর্ণ শব্দ গঠন কর।

নাক্তহগুমু ------------------------ স্বাধিস্থ্যবি-------------------------

মপরিশ্র --------------------------- স্মানস----------------------------

উৎতাকর্ষ------------------------- ভিত্তিক্ষাবৃ ------------------------

রক্ষতিক -------------------------- মতনিয়া--------------------------

পাঠ ২
পিতা-মাতার প্রতি সম্মান

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষাগুলো কী কী

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের আনুগত্য সন্তানের জন্য অপরিহার্য

পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাদের সেবা, সন্তান ও পিতা মাতার মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি করে

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া আল্লাহ সর্বদা কবুল করেন

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সন্তানের জন্য আল্লাহ আখেরাতে জান্নাত রেখে দিয়েছেন

যারা পিতা-মাতাকে সম্মান করে, তারা অন্যের দ্বারা সম্মানিত হয়

আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন পিতা-মাতার প্রতি সম্মান দেখাতে। পিতা-মাতার সাথে ভালো ও কোমল আচরণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের প্রতি যথাযত সম্মান দেখাতে হবে। ভালো ও ন্যায় সঙ্গত কাজে শিশুরা অবশ্যই পিতা মাতার অনুসরণ করবে। তবে পিতা মাতা আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহের নির্দেশ দিলে তাদের মানা যাবে না।

পিতা মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলতে বুঝায়,

- তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো এবং কৃতজ্ঞ হওয়া।
- নম্র, ভদ্রভাবে এবং সম্মানের সাথে তাদের সাথে কথা বলা।
- সাধ্যমত এমন সকল কাজ করা, যা তাদেরকে সন্তুষ্ট ও খুশি করে।
- প্রয়োজনে পিতামাতাকেও ভালো ও সৎ কাজের উপদেশ দেয়া
- পিতা-মাতার কোন কথায় রাগ আসলে তা দেখানো থেকে বিরত থাকা।
- পিতা-মাতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা কেননা ইহা শিরকের পর বড় গুনাহ।
- অন্যের পিতা-মাতাকে অসম্মান করা থেকেও বিরত থাকা। কেননা অন্যের পিতা-মাতা কে অসম্মান করলে সে তোমার পিতা-মাতাকেও অসম্মান করতে পারে।
- পিতা-মাতার খেদমত করা, বিশেষ করে যখন তারা বার্ধক্যে উপনীত হন।
- আল্লাহর কাছে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা, এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও।
- মৃত্যুর পূর্বে মানুষের সাথে করা পিতা মাতার অপূর্ণ ওয়াদা সমূহ পূর্ণ করা।
- পিতা-মাতার আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে উত্তম আচরণ করা ও সম্মান করা।

একটা সন্তান বিশেষভাবে তার মায়ের প্রতি দয়া এবং ভদ্রতা প্রদর্শন করবে। কারণ মা তাকে অনেক কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছেন, তার জন্মকালীন সময়ে অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন এবং তাকে শিশু কালে অতি কষ্টে লালন পালন করেছেন। নবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'সন্তানের জান্নাত তার মায়ের পায়ের নিচে।' এর অর্থ হচ্ছে আমরা আমাদের মায়ের সেবা ও তার প্রতি দয়া দেখানোর মাধ্যমে সহজেই জান্নাত অর্জন করতে পারি। মনে রাখবে, আজ যদি তুমি তোমার পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করো, তবে যেদিন তুমি বড়ো হয়ে সন্তান পাবে সেদিন তোমার সন্তান তোমার সাথে উত্তম আচরণ করবে।

অনুশীলনী ১০

১। পিতা-মাতার সাথে নিচের কোন আচরণ সঠিক আর কোন আচরণ ভুল। উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

	সঠিক আচরণ	**ভুল আচরণ**
দয়া দেখানো		
হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা		
তাদের আনুগত্য করা		
তাদের প্রয়োজন পূরণ		
তাদের জন্য দোয়া না করা		
অন্যের পিতা-মাতাকে অসম্মান করা		
অধৈর্য হওয়া		
উচ্চস্বরে কথা বলা		
ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ জানানো		
কর্কশ ভাষায় কথা বলা		
তাদেরকে দুঃখ দেয়া		
তাদেরকে গুরুত্ব না দেয়া		

২। পিতা-মাতার প্রতি সম্মান দেখানোর তিনটি উপায় লিখ।

ইতিহাসের গল্প
মায়ের সেবা ও আল্লাহর দয়া

অনেকদিন আগের কথা। শরফুদ্দিন নামে এক ছেলে ছিল মায়ের খুবই ভক্ত। সে তার মাকে অনেক ভালোবাসতো। মায়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল তুলনাহীন। পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের শিক্ষা ও তালিম সে পেয়েছিল পরিবার থেকেই।

একদা শরফুদ্দিনের মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বিছানা থেকে দাঁড়াতে পারছেন না। তখনও শরফুদ্দিন ছোট এক বালক। মাঝরাতে তার অসুস্থ মা তৃষ্ণার্ত হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। বললেন, "শরফুদ্দীন, পানি নিয়ে আসো, আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।" "হে প্রিয় মা! আমি আপনার জন্য পানি নিয়ে আসছি" শরফুদ্দিন জবাব দিল। ছোট ছেলে ঘরের সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করে কোন পানি পেলো না। রাত তখন গভীর। সেই সাথে ঘাড় অন্ধকার ও প্রচন্ড ঠান্ডা। কিন্তু সাহসী শরফুদ্দিন সবকিছুকে উপেক্ষা করেই মায়ের জন্য পানি আনতে ঝর্ণার দিকে ছুটে চলল। কোন বাধাই তাকে আটকাতে পারল না। সে মায়ের প্রয়োজন ও ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিল। অনেক দূরের ঝর্ণা থেকে সে পানি নিয়ে এলো। কিন্তু ততক্ষণে মা তার ঘুমিয়ে পড়েছেন। শরফুদ্দিন ভাবছে সে এখন কি করবে? যদি মাকে সে জাগিয়ে তুলে, তাহলে অসুস্থ মায়ের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে, অথচ তার ঘুম খুবই প্রয়োজন। আর যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে ও মা আবার জেগে উঠে পানি চান, তাহলে কে তাকে পানি দেবে? তখন পানি না পেলে তৃষ্ণায় মায়ের কষ্ট হবে। অনেক ভেবে, সে পানির পেয়ালা হাতে নিয়ে মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। মিনিট থেকে ঘন্টা হচ্ছে। শরফুদ্দিন কিন্তু পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়েই আছে। দেখতে দেখতে রাত শেষ হয়ে এলো। স্বাভাবিক নিয়মেই মায়ের ঘুম ভাঙলো। চোখ খুলেই মা দেখতে পেলেন বিছানার পাশে তার প্রিয় পুত্র শরফুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছে। অবাক বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে আছেন ছেলের দিকে। তখন তার মনে পড়ল, গভীর রাতে তিনি ছেলের কাছে পানি চেয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয় সন্তান আমার কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছো? শরফুদ্দিন তখন সব খুলে বললো। সবকিছু শুনে মা হতবাক। এ তো এক বিস্ময় বালক। ছোট্ট ছেলে মায়ের জন্য কিভাবে এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে? একথা ভেবে মা আনন্দে আত্মহারা। খুশিতে তার দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে এলো। আর তিনি তখনই আল্লাহর কাছে হাত তুলে ছেলের জন্য প্রাণভরে দুয়া করলেন। মা বললেন, 'হে আল্লাহ আমার সন্তানকে দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ দান কর'।

সন্তানের জন্য মায়ের দুয়া ব্যর্থ হয় না। আল্লাহ তার মায়ের দুয়া কবুল করলেন। আল্লাহ শরফুদ্দীনকে এমন জ্ঞান এবং দ্বীনদারী দান করলেন যে, তিনি জগৎ বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তিনি তার সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় আলেম হিসেবে পরিচিত লাভ করলেন। পেতে থাকলেন মানুষের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। মায়ের খেদমতের বিনিময়ে শরফুদ্দিন পেয়েছিলেন মায়ের সন্তুষ্টি, যা জান্নাতের পথ খুলে দেয়।

মায়ের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন এবং মায়ের খেদমত করে শরফুদ্দিন লাভ করেছিলেন আল্লাহর দয়া ও রহমত। মায়ের দুয়ার বরকতে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও সম্মান লাভ করতে পেরেছিলেন।

এ ঘটনা থেকে অর্জিত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক ও অভিভাবক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন ,

- *যাদের ইসলাম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান এবং দ্বীনদারী রয়েছে কেবল তারাই প্রকৃত শ্রদ্ধা লাভ করে থাকে*
- *শিশুরা অবশ্যই ভালো কাজে তাদের পিতা-মাতার অনুসরণ করবে*
- *শিশুরা অবশ্যই তাদের পিতা মাতার সেবা ও খেদমত করবে*
- *আনুগত্য পরায়ণ শিশুদের কাছে কোন কাজই কঠিন নয়*
- *পিতা মাতার উচিত নয় সন্তানের সাধ্যের বাহিরে তাদের উপর কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া*
- *কেবল পিতা-মাতার প্রয়োজন পূরণ করাই দায়িত্ব নয় বরং পিতা-মাতার শান্তির দিকটি খেয়াল রাখা ও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত*
- *একটি শিশু তার পিতামাতার সুবিধার জন্য নিজের কাঁধে অসুবিধাকেও তুলে নিতে পারে*
- *পিতা-মাতার আনুগত্য ও খেদমতের মাধ্যমে সন্তান এবং পিতা-মাতার মধ্যে মজবুত সম্পর্ক তৈরি হয়*
- *সন্তানদের জন্য পিতা মাতার দুয়া সব সময়ই আল্লাহ কবুল করে থাকেন*
- *দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হচ্ছে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং দ্বীনদারী*
- *পিতা মাতার খেদমতকারী সন্তানদের জন্য আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত অপেক্ষা করছে*
- *যারা পিতা মাতার প্রতি সম্মান দেখায় তারা অন্য মানুষের দ্বারা সম্মানিত হয়*

অনুশীলনী ১১

১। উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

	উচিত	উচিত নয়
সন্তানদের উপর সাধ্যের বাইরে কাজ চাপানো		
সন্তান ভুল করলে সাথে সাথেই শাস্তি দেয়া		
সন্তান দুষ্টুমি করলে বদদোয়া দেওয়া		
সন্তান ভুল করলে ক্ষমা করা ও সংশোধনের সুযোগ দেয়া		
দাদা-দাদী ও নানা নানী কে পিতা-মাতার মত সম্মান করা		
ভুল করলে পিতা মাতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া		

২। দাদা-দাদী ও নানা নানীরাও পিতা মাতার মত সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। কিভাবে তাদেরকে সম্মান করা যায় নিচে তা লিখ।

পাঠ ৩
পরিবেশের প্রতি সম্মান

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

পরিবেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ইসলামের শিক্ষা কী

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহর ভয় পরিবেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রেরণা দেয়

পরিবেশের ক্ষতিসাধন মূলত আমাদের নিজেদেরই ক্ষতিসাধন

সত্য পথের সন্ধান পেতে হলে প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা থাকতে হবে

বাহ্যিকভাবে কষ্টকর বিষয় কখনোও কখনোও কল্যাণ লাভের মাধ্যম হয়

মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, তাকে জোরপূর্বক দাশ বানানো মহাপাপ

স্বাধীন জীবন যাপন ছাড়া আল্লাহর পূর্ণ ইবাদত বন্দেগী করা সম্ভব নয়

যখন যেভাবেই সুযোগ আসে পরিবেশ সুরক্ষার চেষ্টা করতে হবে

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য তিনি আমাদের চারি পাশের মনোরম পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি পৃথিবী,যাতে আমরা বাস করি, বিশাল আকাশ, যা ছাদ সদৃশ ও পাহাড়-পর্বত ও সাগর কে, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

গাছ-পালা, ফল-ফসল ও নদ-নদী পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ,যা আমাদের খাদ্যের উৎস। আল্লাহ পরিবেশকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল এবং পরিচ্ছন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশকে সুদৃশ্য, সুগঠিত ও পরিপাটি রাখতে। ঘর-বাড়ি, মসজিদ-মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজ আমাদের পরিবেশেরই অংশ। খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট, বাজার ও অফিস আদালতও পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সব কিছুকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। এসব নিয়ম মাফিক পরিচালনা এবং পরিষ্কার রাখা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব।পরিবেশের যত্ন নেয়া ও তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা আমাদের বিশ্বাসের অংশ।পরিবেশের প্রতি যত্নবান হওয়ার মাধ্যমে আমরা পরিবেশের প্রতি সম্মান দেখাতে পারি।

অনুশীলনী ১২

১। উত্তরের সঠিক অংশটি বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত কর।

ক. **আল্লাহ/আমরা** আমাদের চতুর্পার্শ্বের পরিবেশের স্রষ্টা।

খ. পরিবেশ বলতে বুঝায় কেবলই **প্রকৃতি/আমাদের** চতুর্পাশের সবকিছু।

গ. বন-জঙ্গল এবং নদী-নালা পরিবেশের **অংশ/অংশ নয়**।

ঘ. আল্লাহ পরিবেশকে করেছেন **সুন্দর এবং সুনিপুণ/অসুন্দর ও বিশৃঙ্খল**।

ঙ. **আল্লাহ/মানুষ** পরিবেশকে বিশৃঙ্খল ও অসুন্দর করে তোলে।

চ. আমাদের **উচিত/উচিত নয়** পার্ক এবং রাস্তাগুলোকে সুন্দর ও পরিষ্কার রাখা।

ছ. **আমাদের/শিক্ষকদের** কর্তব্য হল মাদ্রাসা এবং স্কুলকে পরিচ্ছন্ন রাখা।

জ. পরিবেশের প্রতি **যত্নবান হওয়া/অবহেলা দেখানো** আমাদের ঈমানের অংশ।

২। বাক্যটি পূর্ণ কর:

"একজন মুসলিম হিসেবে আমি অবশ্যই পরিবেশের প্রতি ---------------------- হবো।"

শিক্ষক ও অভিভাবক:

অপ্রোজনে কেবল লোভের কারণে কিছু মানুষ পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশকে ধ্বংস করে। মানুষ অনেক সময় পরিবেশকে এমনভাবে দূষিত করে যা আমাদের সবুজ পৃথিবীকে বিষাক্ত করে তুলে। কেবল আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ই মানুষকে পরিবেশের ক্ষতি সাধন এবং ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। একজন মুসলিম তার পরিবেশের সংরক্ষণ শুধু এ কারণেই করে না যে, এটা তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন বরং সেই সাথে সে পরিবেশকে সংরক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করে। পরিবেশকে যথাযত সংরক্ষন ও পরিপাটি রাখার মাধ্যমে ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হতে চায় কারণ খলিফা হিসেবে এটা তার দুনিয়াতে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের গল্প
সত্য সন্ধানী সাহাবীর বৃক্ষ রোপন

সালমান রা. নবী মুহাম্মদ সা. এর এক বিখ্যাত সাহাবী। তিনি ইরানের (পারস্যের) অধিবাসী ছিলেন। তাই তাকে ফারসি বলা হতো। তিনি ছিলেন সত্য সন্ধানী এক আত্মত্যাগী ব্যক্তি। তার পিতা-মাতা ছিলেন অগ্নিপূজক। কিন্তু কিশোর সালমান অগ্নি পূজাকে ঘৃণা করতেন। তিনি সত্য ধর্মের খুঁজে বেরিয়ে পড়েন। দীক্ষিত হন ঈসায়ী (খ্রিষ্টান) ধর্মে। তার পিতামাতা এতে তার উপর ক্ষিপ্ত হন। ফলে তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নেন এক খ্রিষ্টান উপসনালয়ে। একের পর এক খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অবশেষে উপনীত হন সিরিয়ায়। তার শেষ গুরু যাজকের পরামর্শে আখেরি নবীর সন্ধানে মধ্যআরবের আল-কুরায় আগমন করেন। মরুভূমির অচেনা এই দেশে তিনি প্রতারিত হন। তার রাহবার (পথ প্রদর্শক) বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে জোরপূর্বক গোলাম বানিয়ে এক ইহুদীর কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই ইহুদি তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসে। কিন্তু মদিনায় আসা তার সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়।

ঠিক সেই সময়ে আখেরি নবী মুহাম্মদ সা. মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। যাজকদের কাছ থেকে তিনি আখেরি নবীর আগমন ও তার গুণাবলি সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা. এর মধ্যে নবুওয়তের আলামতসমূহ প্রত্যক্ষ করে তিনি মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তিনি তখনও এক ইহুদির কৃতদাস। দাসত্বের কারণে ইসলামের সকল বিধি বিধান সঠিভাবে পালন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দাসত্বের কারণে সালমান রা. বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ নিতে পারেননি। দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি নবী মুহাম্মদ সা. এর পরামর্শ চাইলেন। নবীজি বললেন, তুমি তোমার মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যাও।

সালমান রা. বলেন, অতঃপর আমি, "চল্লিশ উকিয়া (স্বর্ণ) এবং তিনশটি খেজুর গাছ লাগিয়ে দেয়ার শর্তে মুক্তি লাভের চুক্তি করলাম। রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদের আহ্বান করলেন আমাকে সহযোগিতা করতে। সাহাবীগণ প্রত্যেকেই সাধ্য অনুযায়ী আমাকে খেজুর চারা দিলেন। তিনশটি চারা হয়ে গেলে আমি গর্ত করলাম। সকলে আমাকে সাহায্য করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. এসে নিজ হাতে চারাগুলো রোপণ করলেন। আমরা সকলে তাকে সহযোগিতা করলাম। আল্লাহর কসম, তিনশটি চারার একটিও মরেনি! এভাবে তিনশ খেজুর গাছের শর্ত পূরণ হল। বাকি থাকল চল্লিশ উকিয়া (স্বর্ণ)। একদিন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে নবীজীর কাছে স্বর্ণ আসলে তিনি তা দিয়ে চল্লিশ উকিয়া (স্বর্ণ) পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন। আর এভাবেই আমি দাসত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলাম।" সালমান ফারসি রা. স্বাধীন হয়ে আজীবন ইসলামের খেদমত করে গিয়েছেন।

দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য গাছ লাগানোর চুক্তি আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। এর মাধ্যমে সালমান ফারসি রা. দুই ধরণের পরিবেশ রক্ষা করেন। প্রথমত তিনি নিজের জন্য স্বাধীনভাবে ইসলামী বিধি বিধান পালনের পরিবেশ তৈরী করেন, যা তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেয়। দ্বিতীয়ত খাদ্য সমস্যার সমাধান ও পরিবেশের উন্নতি সাধন করেন, যা মানবতাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। তিনি জানতেন, ইসলামে গাছ লাগানো অনেক বড় পুণ্যের কাজ। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

"যখন কোনো মুসলিম কোন বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোনো ফসল বোনে, আর মানুষ, কিংবা পশু-পাখি তা থেকে খায়, তা রোপণকারীর জন্য সদকা তথা পুণ্যের কাজ হিসেবে গণ্য হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *যারা হেদায়াত ও সত্য পথ খুঁজে পেতে চায়, আল্লাহ তাদেরকে সত্য পথ দেখান*
- *আল্লাহ যাকে সত্য দীনে নিয়ে আসতে চান তাদেরকে কোন বাঁধা আটকে রাখতে পারেনা*
- *মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা মানুষকে কখনো শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারে না*
- *খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকদের মধ্যে অনেক সত্য প্রিয় লোক রয়েছে, যারা সত্য কে স্বীকার করে*
- *অচেনা অজানা লোককে পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া সবসময় বিশ্বাস করতে নেই*
- *অনেক সময় যে বিষয়টিকে আমরা আমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করি, হতে পারে তা আমাদের জন্য কল্যাণকর*
- *আখেরি নবী দুনিয়াতে আসার আগেই আল্লাহ তার অবস্থানস্থল ও গুণাবলি সম্পর্কে পূর্ববর্তী উম্মতকে অবহিত করেছেন*
- *সত্য খুঁজে পাওয়ার জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না, অন্তর চক্ষু দিয়ে খুঁজলে অনেক সহজেই সত্য পাওয়া যায়*

* *দাসত্ব মানুষের জন্য একটি কষ্টকর ও অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থা, যা থেকে মানুষ মাত্রই মুক্তি চায়*
* *যে দাসত্ব ও মানুষের প্রভুত্ব হতে মুক্ত হতে চায় আল্লাহ তাকে তার ব্যবস্থা করে দেন*
* *বিপদ মুসিবতে আল্লাহর উপর ভরসা করে সাহায্য চাইলে আল্লাহ বিপদ দূর করে দেন*
* *মুমিনদের উচিত একে অন্যকে ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং অভাব ও সমস্যা দূরীকরণে এগিয়ে আসা*
* *আমরা যখনই কোন কাজ করব, তখন তা মানবতার জন্য কল্যাণকর কিনা তা বিবেচনায় রাখবো*
* *গাছ লাগানো এমন একটি সওয়াবের কাজ, যা মানুষের কোন না কোন ভাবে উপকারে আসে*
* *যে কাজ থেকে পশু পাখি বা পরিবেশ উপকৃত হয় তাতেও মুমিন ব্যক্তির জন্য সওয়াব রয়েছে*

অনুশীলনী ১৩

১। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর। উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ ক. সালমান রা. ছিলেন মূলত আরবের অধিবাসী।

☐ ☐ খ. সালমান রা. এর পিতা-মাতা ছিলেন খ্রিষ্টান।

☐ ☐ গ. সালমান রা. ছিলেন সত্য ধর্ম খুঁজে পেতে প্রবল আগ্রহী।

☐ ☐ ঘ. তিনি পথ হারিয়ে মদিনায় চলে আসেন।

☐ ☐ ঙ. মদিনায় আগমন তার জন্য কল্যাণের পথ সুগম করে।

☐ ☐ চ. তার মনিব ছিল এক ইহুদি ব্যক্তি।

☐ ☐ ছ. দাসত্ব ইসলাম পালনের পথে কোন বাধা নয়।

☐ ☐ জ. গাছ লাগানো ও পরিবেশ রক্ষা অতি পুণ্যের কাজ।

ফিকহ

শিক্ষক ও অভিভাবক:

পরিচ্ছন্নতা: একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি সকল দিক থেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পূতপবিত্র থাকে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস তাকে শিরক হতে মুক্ত রাখে। আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে মুমিন তার আত্মাকে পরিছন্ন ও পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়। আর দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা রক্ষা ঈমানদার ব্যক্তির দৈনিক কার্য তালিকার অংশ। নিয়মিত চুল দাঁড়ি ও মোচ কেটে ছেটে রাখা এবং নখ ও শরীরের অযাচিত লোম কেটে ফেলা মুমিনের অন্যতম একটি অভ্যাস। বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার অজু করে তার সালাত আদায়ের জন্য। সে অজুতে তার মুখমণ্ডল, হাত ও পা ধৌত করে এবং মাথা মাসেহ করে। যা পবিত্রতার পাশাপাশি রোগ জীবাণু প্রতিরোধে বলিষ্ট ভূমিকা রাখে। সে তার শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে নিয়মিত গোসল করে ও তার কাপড়-চোপড় কে ধুয়ে পরিষ্কার ও পবিত্র রাখে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা ও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা মুমিন জীবনের অন্যতম অংশ। অতএব একজন মুমিন সকল দিক থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে তার জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে মেনে চলে।

একজন ঈমানদার তার শরীর থেকে নিয়ে ঘর পর্যন্ত সবগুলো বিষয়কে না গুছিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে না। এই পরিচ্ছন্নতায় সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও বিবেচনায় রাখে। পরিচ্ছন্নতার এই শিক্ষা ঈমানদার তার প্রতিবেশী থেকে চতুষ্পার্শ্বের সকল লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় আর এভাবেই গোটা পরিবেশ ক্রমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ভরে উঠে।

একজন সাধারণ মানুষের কাছে পরিচ্ছন্নতা কেবল পরিচ্ছন্নতাই। কিন্তু একজন ঈমানদারের কাছে তা পরিচ্ছন্নতা হওয়ার পাশাপাশি একটি ইবাদতও। কারণ একজন ঈমানদার বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদেরকেই বেশি পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন যাপন করে। ঈমানদার যখন তার বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করে তখন সে মনে মনে একথা বলে, হে আল্লাহ আমার শরীরের পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আমার অন্তরাত্মাকেও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দাও। আর এভাবেই তার সেই দুয়া তার আত্মাকে পবিত্র করে, যেভাবে তার শরীর পবিত্র হয়।

আজান: ঈমানদারদেরকে নামাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান করার জন্য আজানকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য আজানের অন্যতম লক্ষ্য হলো দুনিয়াবাসীর কাছে ইসলামের সৌন্দর্য এবং একত্ববাদের কথা গুলো উন্নত ভাষা শৈলীর মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া। সালাতের জন্য সরাসরি এই আহ্বান অনেক অমুসলিমের অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছে।

প্রায় সকল ধর্মেই লোকদের উপাসনার জন্য আহ্বান করার বিধান আছে। তবে অন্যান্য ধর্মের আহ্বান পদ্ধতি গুলোর চেয়ে আযান সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি বিষয়। এটা এমন একটি পদ্ধতি যাতে কোন বস্তু ব্যাবহারের পরিবর্তে মুমিনের আত্মা ও হৃদয়কে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেখানে আহ্বান করে বস্তু ব্যাবহার যেমন হর্ন বাজানো, ঘন্টা পিটানো বা এ জাতীয় কিছু করে, সেখানে সালাতের আজান আসে হৃদয়ের গহীন থেকে যা অন্য হৃদয়ে নব চেতনার উদ্রেক করে।

আল্লাহ তার সীমাহীন বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আজানকে চেয়েছেন সেটা যেন কেবল একটি আহ্বান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে বরং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা যেন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই সাথে তা যেন হয় ইসলামের প্রতি আহ্বানের একটি অন্যতম মাধ্যম। আজানে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা মুমিন ব্যক্তির ঈমানকে প্রতিদিন নবায়ন করে ও ইসলামের ভালোবাসায় উজ্জীবিত করে এবং তার আত্ম আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হতে অনুপ্রাণিত করে।

সালাত: শারীরিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি একজন মানুষকে তার আত্মার প্রয়োজনও পূরণ করতে হয়। আর

আত্মার প্রয়োজন হল তার ঈমানকে জীবন্ত রাখা এবং শক্তিশালী করা। মুমিন বান্দার উচিত সর্বদা তার আভ্যন্তরীণ কল্যাণের সংরক্ষণ এবং তার উন্নতি সাধন । কোন ব্যক্তির জন্য কেবল এটাই যথেষ্ট নয় যে, সে বলবে, আমি বিশ্বাস করলাম। বরং তার উচিত সেই বিশ্বাসের পাশাপাশি তার নৈতিক মানকে উন্নত করা ও সচল রাখা। ঈমানের পরিপুষ্টতা বিধান ও তাকে সচল রাখার নিমিত্তে আল্লাহ তার বান্দাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অবশ্য করণীয় বা ফরজ করেছেন। সালাত মুমিনের আত্মার খোরাক। সালাত মুমিনকে আল্লাহর অবাধ্যতা হতে বিরত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আনকাবুত: ৪৫]

ঈদ সালাত: অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামে ও বিশেষ কিছু উৎসব রয়েছে। ইসলামের কোন উৎসব কেবল আনন্দের জন্য নয় বরং আনন্দের পাশাপাশি তা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় হয়। ইসলামে বছরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব রয়েছে, তা হল ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা।

ঈদুল ফিতর: ঈদুল ফিতর উদযাপন হয় রমজান মাসের শেষে একমাস রোজা উদযাপনের পর। মুসলিম তার আনন্দ এবং খুশি সম্মিলিতভাবে একটি সালাত আদায়ের মাধ্যমে সেই দিন প্রকাশ করে। পূর্ণ এক মাস রমজানের রোজা রাখার মাধ্যমে মুমিন আল্লাহ ভীতি অর্জনের ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের একটি কঠিন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে। প্রশিক্ষণ শেষে আসে আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার প্রাপ্তির পালা। ঈদুল ফিতর হলো সে পুরস্কার লাভের দিন। ঈদুল ফিতরে মুমিনের মূল প্রাপ্য হয় আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও রহমত লাভ। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এই দিনে মুসলমানদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এটি ছুটির দিন এবং শরীর ও আত্মার প্রশান্তি লাভের দিন। বিশেষ খাবার-দাবার সেদিন রান্না করা হয় এবং ঐতিহ্য মতো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো এবং শিশুদেরকে পুরস্কার ও উপহার প্রদান করা হয় । মুসলিমরা সেদিন তাদের উন্নত কাপড়টি পরিধান করে আনন্দ ও খুশির জানান দেয়।

ঈদুল আযহা: ঈদুল আযহা উদযাপিত হয় জিলহজ মাসের **১০** তারিখে এবং তা ঐ মাসের **১২** তারিখ পর্যন্ত করা যায়। নবী ইব্রাহিম আ. এর স্মৃতিচারণ হিসেবে উদযাপিত হয় এই দিন। নবী ইব্রাহিম আ. আল্লাহর সম্মুখে তার সব কিছুকে নিঃসংকোচে উৎসর্গ করছিলেন। তিনি তার প্রাণ প্রিয় সন্তান ইসমাইলকে আল্লাহর নির্দেশে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আল্লাহ তার সেই নিঃসংকোচ আত্মনিবেদনকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে একটি বেহেশতী প্রাণী কে কুরবানি দেয়া হয়েছিল। সেই স্মৃতিকে ধারণ করে মুসলিমরা ঐ দিনে পশু কুরবানি দিয়ে থাকে। আর যারা হজ উদযাপন করেন তারাও পশু কোরবানির মাধ্যমে হজ্জের সমাপ্তি টানেন। এই দিনেও সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করা হয়। সালাত আদায়ের পর যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা একটি পশু যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু বা উট কুরবানি দিয়ে থাকে। কোরবানির পশুর গোশত আত্মীয়, প্রতিবেশী ও দরিদ্র লোকদের মাঝে বন্টন করার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবেই এই উৎসবকে সফল করা হয়।

কুরবানি: কুরবানি মূলত একটি প্রতীকী বিষয়। একটি পশুকে জবাই করে দেওয়ার মাধ্যমে, আমরা এই সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আমাদের জীবন ও সম্পদ সবকিছু আল্লাহর জন্য, আমরা আল্লাহর জন্যই বেঁচে থাকব, আর আল্লাহর জন্যই আমরা আমাদের ধন-সম্পদ জীবন সবকিছুকে উৎসর্গ করবো, যেখানে প্রয়োজন হবে আমরা আমাদের সম্পদ বিলিয়ে দেব, এমনকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনে আমাদের জীবন বিলিয়ে দিতেও আমরা ইতস্তত করব না। একটি পশুকে কুরবানি করার সময় আমরা যে দুয়া পড়ি তা একবার লক্ষ্য করুন,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'নিশ্চয়ই আমার সকল ইবাদত, আমার সকল ত্যাগ তিতিক্ষা ও কুরবানি, আমার বেঁচে থাকা ও আমার মরে যাওয়া সবই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের রব'। (সূরা আনআম: ১৬২)

পাঠ ১
গোসল

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

ইসলামে গোসলের প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা কী

শারীরিক দুর্গন্ধ অন্যের জন্য কষ্টের কারণ ও শান্তি বিনষ্টকারী

শরীরকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে গোসল হচ্ছে অন্যতম একটি উপায়

স্বচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় পরিচ্ছন্নতার বিধি মেনে চলতে হবে

ভালো কাজের পুরস্কার ব্যক্তিকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে

কাউকে সংশোধনকালে তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত

ভদ্রতার সাথে যে শিক্ষা দেয়া হয় তা লোকেরা সাদরে গ্রহণ করে

গোসল আরবি শব্দ। গোসল অর্থ হচ্ছে ধৌত করা। তবে ইসলামে গোসল বলতে মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা বুঝায়। একটি পরিপূর্ণ গোসলের ক্ষেত্রে ছয়টি ধাপ অবলম্বন করা উচিত। সে ধাপগুলো হল:

১. প্রথমেই এই নিয়ত করা যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পবিত্রতা হাসিল করা হচ্ছে।

২. দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ভালোভাবে তিনবার ধৌত করা।

৩. বাম হাত দিয়ে গোপনাঙ্গ কে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেয়া যাতে কোন ধরনের ময়লা ও দুর্গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে।

৪. অতঃপর একটি পূর্ণ ও সুন্দর অজু করা। শুধু পা ধৌত করা বাকি থাকবে।

৫. সারা শরীরে নিম্ন ক্রমানুসারে পানি ঢেলে শরীর পরিষ্কার করা:

- মাথার উপর তিনবার পানি ঢালা।
- ডান বাহুর উপর তিনবার পানি ঢালা।
- বাম বাহুর উপর তিনবার পানি ঢালা।

৬. অবশেষে পায়ে পানি ঢেলে পা ধৌত করা ও পরিষ্কার করা।

মনে রাখা আবশ্যক, গোসলে যদি শরীরের কোন একটি অংশ শুকনো থেকে যায়, তাহলে গোসল হবে না এবং পুনরায় গোসল করে নিতে হবে।

গোসল কালীন সময়ে পর্দা পুশিদা পূর্ণ বজায় রাখতে হবে। অন্য লোকের সম্মুখে গোপন অঙ্গ প্রকাশ করা যাবে না। অন্য লোকের গোপন অঙ্গ দেখা ইসলামের সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ।

গোসল কালীন সময়ে কিবলামুখী না হওয়া উচিত। দাঁড়িয়ে কিংবা বসে উভয় অবস্থায় গোসল করা যায়। তবে বসে করা উত্তম।

গোসলে পানির অপচয় করা যাবে না। চেষ্টা করতে হবে কম সময় ব্যয় করার। তাছাড়া গোসল কালীন সময়ে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা উচিত।

গোসলের পানি অবশ্যই পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র হওয়া উচিত। অন্যের ব্যবহৃত ও ময়লা পানি দিয়ে গোসল করা যাবেনা।

পায়ে পানির ছিটা পড়লে গোসলখানা থেকে বের হওয়ার আগে আবারো পা ধোয়ে নেয়া উচিত।

প্রতিদিন একবার গোসল করা ভালো অভ্যাস। তবে প্রতিদিন সম্ভব না হলে সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন, শুক্রবার গোসল করা আবশ্যক।

অনুশীলনী ১৪

১। বাম পাশের সাথে ডান পাশের সমন্বয় সাধন কর।

বাম পাশ	ডান পাশ
ধাপ-১	দুই পা ধোয়া
ধাপ-২	দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া
ধাপ-৩	গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা
ধাপ-৪	নিয়ত করা
ধাপ-৫	অজু করা
ধাপ-৬	সারা শরীর ধৌত করা

হাদিসের গল্প
আরব বেদুইন ও জুমার প্রস্তুতি

দিনটি ছিল শুক্রবার। মুসলমানদের সালাতুল জুমা আদায়ের দিন। নবী মুহাম্মদ সা. এর মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন ছিলেন বেলাল রা.। দুপুর পার হতেই বিলাল রা. মসজিদের মিনার থেকে সুমধুর কণ্ঠে আযান দিলেন। আহ কী মোহনীয় সেই সুরের মূর্ছনা! সুমিষ্ট কণ্ঠের আযানের ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো মদিনার প্রতিটি ঘরে ও পথে প্রান্তরে। প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল সে আযানের মোহনীয় আবেশ।

মদিনা একটি ব্যস্ততম নগরী। কিন্তু জুমার দিনে সকলে কাজ বন্ধ রেখে জুমার সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত। সর্বত্র যেন আনন্দের আমেজ ও সকলের মাঝে সালাতের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা। প্রত্যেকে যার যার মত করে নখ কেটে গোসল করে প্রস্তুত। পুরুষরা দাড়ি-গোঁফ কাটসাট করে প্রস্তুত। অতঃপর সবচেয়ে উন্নত এবং পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ে ঈদের সাজে তারা মসজিদের দিকে পা বাড়ালো। শিশুরাও প্রস্তুত। তারা মায়েদের সাথে সুন্দর জামা কাপড় পড়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। সকলের গায়ে আঁতর গোলাপের ঘ্রাণ। সুমিষ্ট ঘ্রাণ মৃদু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র । আহা জুমার দিনের মদিনার সেই দৃশ্য কত আনন্দের। এ যেন জান্নাতি পরিবেশে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া এক লোভনীয় দৃশ্য। সবাই আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে মসজিদে এসে হাজির। একে অন্যকে সালাম দিয়ে অভিবাদন জানিয়ে মসজিদে প্রবেশ করছে এবং পাশাপাশি বসে পড়ছে। সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছে মসজিদে নববীতে নবীজির আগমনের অপেক্ষায়। প্রিয় নবীর কাছ থেকে তারা জুমায় নতুন কিছু শিখবে। লাভ করবে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা।

সেখানে নেই আরব-অনারব কোন ভেদাভেদ। নেই সাদা-কালোর কোন তারতম্য। ধনী-গরিব হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে পাশাপাশি বসে আছে। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষায় সকলেই উজ্জীবিত। মসজিদের ভিতরে পিনপতন নীরবতা। নেই কোন ধাক্কা ধাক্কি। নেই কোন উচ্চবাচ্য। আপন ভাইয়ের মত পাশাপাশি বসে সবাই অপেক্ষায় আছে বিশ্ব নবীর।

সবাই বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। মসজিদে যেন চন্দ্র উদিত হচ্ছে। হ্যাঁ, বিশ্বনবী এসে পড়েছেন। সকলের চোখেমুখে আনন্দ উল্লাস। নবীজি মুচকি হেসে সকলকে সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল কালো রঙ্গের বড় পাগড়ী, যার এক প্রান্ত ঝুলছিল তার কাঁধে রাখা ঝুলন্ত চাদরের উপর। এই ছিল অসাধারণ এক সুন্দর দৃশ্য।

নবী মুহাম্মদ সা. অত্যন্ত শান্তভাবে মিম্বরের উপর পা রাখলেন এবং উৎসুক জনতার দিকে মুখ করে আবারো তাদের সালাম দিয়ে মিম্বরের অন্য সিঁড়িতে বসে পড়লেন।

ঠিক তখনি কিছু গ্রামীণ বেদুইন ও রাখাল মসজিদে এসে প্রবেশ করলো। তারা সারাদিন বাগানে কাজ করেছে ও প্রচন্ড গরমের মাঝে মেষ-উট ছড়িয়েছে। অবশেষে তাড়াহুড়া করে মসজিদে চলে এসেছে। তারা শহর থেকে দূরে গ্রামে অবস্থান করে। ফলে ইসলামের অনেক শিক্ষাই তারা সঠিক ভাবে পায়নি। তাদের পরনের ঘর্মাক্ত কাপড় গুলো থেকে এক ধরনের উদ্ভট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। মসজিদে অবস্থানরত অন্য লোকেরা তা ভালো চোখে দেখছিল না। কিন্তু কেউ সরাসরি কিছু বলছে না । নবী মুহাম্মদ সা. ও অন্যদের মত বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাই বলে লোকদের মুখের উপর কিছু বলে দেয়া তার জন্য সমীচীন হবেনা। নবী মুহাম্মদ সা. কেবল দেখতেই সুন্দর ছিলেন না, তার আচার ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তাই তিনি তাদেরকে সরাসরি কিছু বললেন না। তবে বিষয়টি কে একবারে এড়িয়ে যাওয়া ও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তা অন্যদের কষ্ট দিচ্ছে। তিনি বিলম্ব না করে খুতবার জন্য মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও নম্রভাবে লোকদের সম্মোধন করে বলতে লাগলেন,

“হে লোক সকল! শুনে রাখো। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ শুক্রবারে গোসল করে এবং সেই গোসলে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভালোভাবে ধৌত করে অতঃপর (শরীর ও মাথায় তেল দিয়ে দাড়ি ও চুল ভালোভাবে আঁচড়ে নিয়ে ও সুগন্ধি ব্যবহার করে) পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে চলে, অতঃপর কারো সাথে ধাক্কাধাক্কি না করে যেখানেই স্থান পায় যথাসম্ভব ইমামের কাছাকাছি স্থানে বসে পড়ে। অতঃপর কোন কথাবার্তা না বলে মনোযোগ সহকারে ইমামের খুতবা শুনতে থাকে, (অতঃপর তার জন্য নির্ধারিত সালাত যথারীতি আদায় করে নেয়,) তবে সেই ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে তার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য সে পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে, যে পরিমাণ সোয়াব ও পুরস্কার পেত সারা বৎসর নফল সালাত ও নফল রোজা রাখলে।“

শ্রোতারা এই চমৎকার খুৎবা শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। আজকের খুৎবায় তারা যেন এমনটিই আশা করছিলেন। নবী মুহাম্মদ সা. কত চমৎকারভাবে বেদুইনদেরকে কিছু না বলেই গোসলের গুরুত্ব নিয়ে কথা বললেন। শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উৎসাহিত করলেন। একই সাথে তিনি বেদুইনদেরকে কোন প্রকার লজ্জাও দিলেন না। তিনি তার খুতবা চালিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে লোকেরা অনেক শিক্ষা লাভ করল । তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা তারা লাভ করল তা হচ্ছে, কাউকে কিছু শিক্ষা দেয়ার সময় ভদ্রতা অবলম্বন করা এবং তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

নবী মুহাম্মদ সা. আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, কিভাবে সরাসরি এবং সঠিক পন্থায় লোকদেরকে কোন প্রকার লজ্জা না দিয়ে সংশোধন করতে হয়। তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন, শুক্রবার দিনে গোসল আদায়ের কারণে কিভাবে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেন। এই পদ্ধতিতে লোকেরা ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয় এবং তারা ইসলামের সৌন্দর্যের পথ অবলম্বন করতে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠে।

এ গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *শুক্রবার সাপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ দিন ও সালাতুল জুমা আদায়ের দিন*
- *মোয়াজ্জিনের কণ্ঠ হবে বলিষ্ঠ এবং মিষ্টি মধুর যা শ্রোতাদের আকর্ষণ করবে*
- *মুসলিম ব্যক্তি জুমার দিনে আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করে নেবে*
- *জুমার দিনের অন্যতম সুন্নাহ হল, গোসল করা, উত্তম কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি মাখা, দাড়ি চুল পরিপাটি করা,*
- *পাগড়ী বা টুপি দিয়ে মাথা ঢাকা এবং ঢিলে ও লম্বা জামা পরিধান করাও জুমার দিনের সুন্নাহ*
- *মহিলা এবং শিশুরা ও জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করবে, যদি মসজিদে সে ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকে*
- *নোট: জুমার সালাতে মহিলারা এমন কোন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না যা দূরে ছড়ায়*
- *মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখতে হবে ও সর্বত্র সুগন্ধি ছড়িয়ে দিতে হবে*
- *সকলকে সমান চোখে দেখা উচিত । ইসলামে ধনী-গরিব ও সাদা-কালো কোন ভেদাভেদ নেই*
- *মসজিদে উচ্চবাচ্য করা, ঠেলাঠেলি করা ও অন্যের ইবাদতে ব্যঘাত ঘটানো মোটেই উচিত নয়*
- *মুসল্লিরা জুমার দিনে ধৈর্য সহকারে ইমামের জন্য অপেক্ষা করবে*
- *ইমাম কিছুটা বিলম্ব করলেও মুসল্লিদের তাতে আপত্তি করার কিছু নেই*
- *ইমাম নিজেকে সুন্দর পোশাকে সজ্জিত করে ও পরিপাটি হয়ে মসজিদে আসবেন*
- *ইমাম কখনো অপরিচ্ছন্ন ও ময়লা কাপড় নিয়ে মসজিদে আসবেন না*
- *ইমাম সকলের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হবেন এবং সকলের সমস্যাকে সমানভাবে বিবেচনায় রাখবেন*
- *কথা বলার সময় ইমাম এমন কোন ভাষা প্রয়োগ করবেনা যাতে কোন ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হয়*
- *জনসমাবেশে কখনো দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা কাপড়-চোপড় নিয়ে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়*
- *শরীরের দুর্গন্ধ অন্যের জন্য কষ্টের কারণ, আর ইসলামে অন্যকে অহেতুক কষ্ট দেয়া উচিত নয়*
- *শরীরের দুর্গন্ধ দূর করার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে সঠিকভাবে গোসল করে নেয়া*
- *যথা সম্ভব মসজিদে ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা উচিত*
- *ইমামের খুতবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা সকলের কর্তব্য*
- *খুৎবা কালীন সময়ে কোন ধরনের শব্দ কর বা কথাবার্তা বলা অনুচিত*
- *আল্লাহ তাদেরকে অনেক পুরস্কৃত করেন যারা নবীজির সুন্নাহ অনুসরণ করে চলে*
- *নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর শারীরিক গঠন এবং অত্যন্ত উন্নত আচার ব্যবহারের অধিকারী*
- *কাউকে সংশোধন করতে গিয়ে লজ্জায় ফেলা উচিত নয়*
- *সংশোধনের ভাষা হবে ভদ্র মার্জিত ও ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে মুক্ত*
- *লোকদেরকে ভালো কাজে উৎসাহিত করার অন্যতম একটি উপায় হল পুরস্কৃত করা*

অনুশীলনী ১৫

১। তোমার অভিভাবক বা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে নিচের কোরআনের আয়াত ও হাদিসটি পূর্ণ করো:

“আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা (অপরাধ করার পর তার কাছে) -------------- করে এবং তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন যারা --------------- অবলম্বন করে।” (সূরা আল বাকারা: ২২২)

“এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী যে, তারা প্রতি ---------------------কমপক্ষে একবার গোসল করবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

পাঠ ২
আজান

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

আজান কী এবং আজান দেয়ার পদ্ধতি ও আদব কী

কোথাও জীবন নাশের আশঙ্কা থাকলে গোপনে ইবাদত করা যেতে পারে

নামাজ সম্মিলিতভাবে জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করতে হবে

মুসলমান কখনো অন্য ধর্মের কোন কিছুকে অনুসরণ করে না

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ হবে সুন্দর, বলিষ্ঠ এবং সুউচ্চ যা বহুদূরে পৌঁছায়

আজানে আল্লাহর প্রশংসার পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াতও আছে

আজান মানে হচ্ছে ডাকা বা অবহিত করা। আজান হচ্ছে লোকদেরকে নামাজের জন্য ডাকার ইসলামী পদ্ধতি। আজান ইসলামের অন্যতম নিদর্শন বা প্রতীক। আজানের মাধ্যমে প্রতিটি মুমিনের অন্তর এক ঈমানী শক্তিতে উজ্জীবিত হয়।

আজান আল্লাহর প্রশংসার পাশাপাশি অমুসলিমদের ইসলামের দিকে ডাকারও উপায়। যে ব্যক্তি নামাজের জন্য মসজিদে আজান দেয় তাকে বলা হয় মুয়াজ্জিন।মুয়াজ্জিনের জন্য ইসলামে বড় সম্মান ও পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। মুয়াজ্জিন মুসলিম জনতাকে মসজিদে সম্মিলিত নামাজ আদায়ের আহ্বান করেন।মুয়াজ্জিনের আওয়াজ হবে বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার এবং কণ্ঠস্বর হবে মিষ্টি ও আকর্ষণীয়।

বেলাল বিন রাবাহ রা. ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। বেলাল রা. ছিলেন একজন আফ্রিকান ক্রীতদাস, যাকে আবু বকর রা. কিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।বেলাল রা. ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী নবীজির একজন প্রিয় সাহাবী।আজান এমন জায়গা থেকে দেওয়া হবে যাতে সম্ভাব্য সকলে তা সহজে শুনতে পায়।অনেক মসজিদে আজান দেয়ার জন্য উঁচু মিনার আছে।

অনেক মসজিদে মাইকে আজানের ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে সর্বত্র আযান সহজে পৌঁছে যায়। অনেকে আজান ঘড়ি ব্যবহার করেন, যা নামাজের সময় তাদের সতর্ক করে। আবার অনেক মসজিদ এবং সংস্থা নামাজের সময়সূচী প্রকাশ করে থাকে। যখন আমরা আজান শুনি তখন আমাদের পার্শ্ববর্তী মসজিদে উপস্থিত হওয়া উচিত।যদি কারো বাড়ির আশেপাশে কোন মসজিদ না থাকে, তবে সে নিজ বাড়িতে আজান দিয়েই নামাজ আদায় করতে পারে।

মুসলিম পুরুষদেরকে অবশ্যই মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামাজ আদায় করতে হবে।একাকী নামাজের চাইতে জামায়াতে নামাজে ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।অবশ্য মহিলারা ঘরে নামাজ আদায় করলেও জামায়াতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন।

দৈনিক পাঁচবার সালাতের জন্য মসজিদে পাঁচবারই আজান দিতে হবে। মুয়াজ্জিন কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তার দুই কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে উচ্চস্বরে আজান দিবেন। দুই কানে আঙ্গুল ঢুকালে আওয়াজ উচ্চ হয়। মসজিদে আজান শোনা গেলে কাজ বন্ধ করে মনোযোগ দিতে আজান শুনতে হবে এবং নামাজের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

নিচে আজানের বাক্যগুলো অর্থসহ দেয়া হলো যাতে আমরা তা শিখে নিতে পারি:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

১। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ،

أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ

২। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ،

أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ

৩। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল।

حيَّ علَى الصَّلاةِ،

حيَّ علَى الصَّلاةِ،

৪। সালাতের দিকে আসো।

সালাতের দিকে আসো।

حيَّ علَى الفلاحِ،

حيَّ علَى الفلاحِ،

৫। সফলতার দিকে আসো।

সফলতার দিকে আসো।

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

৬। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

৭। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

অবশ্য ফজরের সালাতের জন্য যে আযান দেয়া হবে, তাতে حيَّ علَى الفلاحِ বলার পর নিচের বাক্যটি দুইবার বলতে হবে।

الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ

৮। ঘুমের চাইতে নামাজ উত্তম।

অনুশীলনী ১৬

১। উত্তরের সঠিক অংশটি রেখা দিয়ে চিহ্নিত কর।

ক. আজান মানে হচ্ছে **ডাকা/চিৎকার** করা।

খ. আজানে আছে আল্লাহর **প্রশংসা/অমুসলিমদের** তিরস্কার।

গ. যে আজান দেয় তাকে বলা হয় **ইমাম/মুয়াজ্জিন**।

ঘ. মুয়াজ্জিনের আওয়াজ ও কণ্ঠস্বর হবে **বলিষ্ট/দুর্বল**।

ঙ. বেলাল বিন রাবাহ রা. ছিলেন ইসলামের **প্রথম/দ্বিতীয়** মুয়াজ্জিন।

চ. **আবু বকর রা/উমর রা.** বেলাল রা. কে কিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ছ. আজান শুনলে আমাদের পার্শ্ববর্তী মসজিদে উপস্থিত হওয়া **উচিত/উচিত নয়**।

জ. জামায়াতে নামাজে একা পড়ার চাইতে **৫০গুণ/২৭গুণ** বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

ঝ. মহিলারা ঘরে নামাজ পড়েও জামায়াতের **সমপরিমাণ/অর্ধেক** সওয়াব পাবেন।

ঞ. মসজিদে প্রতিদিন **পাঁচবার/ছয়বার** আজান দেয়া হয়।

২। নিচের শব্দ ধাঁধা থেকে তালিকাভূক্ত শব্দগুলো খুঁজে বের করো ও বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করো।

সালাত	মসজিদ	আজান	বেলাল	ডাকা	মুয়াজ্জিন	পাঁচবার

স	ম	সা	স	কা	বে	র
পাঁ	ল	লা	বা	ম	লা	ল
চ	লা	ত	বে	ড	ল	বা
বা	র	ডা	খ	ল	ফ	ম
র	কা	ম	স	জি	দ	ডা
স	ফ	ড	লা	স	ল	আ
ডা	কা	গ	বা	ড	ডা	জা
ল	বা	খ	মু	য়া	জ্জি	ন

হাদিসের গল্প
কীভাবে আজানের প্রচলন হল

ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। মক্কার অধিকাংশ লোক ছিল ইসলামের ঘোরতর শত্রু। মুসলিমরা প্রকাশ্যে ইসলাম পালন করতে পারতো না। কুরাইশদের অত্যাচারের ভয়ে গোপনে সালাত আদায় করতে হতো। আরকাম রা. ছিলেন প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তার ঘর ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে, সাধারণ লোকদের চোখের আড়ালে। তাই মুসলমানরা সালাত আদায়ের জন্য তার ঘরে গিয়ে একত্রিত হতেন। কিন্তু সেখানে সালাতের জন্য প্রকাশ্যে কোন ডাকাডাকি করা হতো না।

কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানরা যখন হিজরত করে মদিনায় এলেন, তখন পরিবেশ অনেকটা বদলে গেল। মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি এখানে মক্কার চেয়ে অনেক বেশি। মদিনায় মুসলমানদেরকে ইবাদত-বন্দেগীতে বাধা দেওয়ার মতো কোনো শক্তি ছিল না।

নবী মুহাম্মদ সা. জামায়াতে সালাত আদায় করার জন্য মদিনায় মসজিদে নববী নির্মাণ করলেন। যখনই নামাজের সময় হতো মুসলমানরা একে অন্যকে "সালাত সংঘটিত হচ্ছে" "সালাত সংঘটিত হচ্ছে" বলে বলে সতর্ক করতেন। যারা এই আওয়াজ শুনতো তারা মসজিদে গিয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করত। কিন্তু অনেকেই এ বিচ্ছিন্ন সতর্কবাণী শুনতে পেতো না। ফলে অনেকে সময় তাদের জামায়াতে নামাজ পড়া সম্ভব হতো না।

নবী মুহাম্মদ সা. একদা মসজিদে নববীতে পরামর্শ সভা ডাকলেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল সালাতে লোকদের ডাকার জন্য একটি স্থায়ী পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। নবী মুহাম্মদ সা. সকলের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করলেন। এক সাহাবী বললেন, আমরা যদি নামাজের সময় মসজিদে পতাকা উড়াই তাহলে লোকজন তা দেখে জামায়াতে শরিক হতে পারবে। কিন্তু এতে অনেকেই একমত হলেন না। কারণ অনেক স্থান হতে পতাকা দেখা সম্ভব হবে না। নবীজিও এই পদ্ধতির সাথে একমত হতে পারলেন না। অন্য এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে আমরা কি সালাতের সময় একটি শিঙ্গা ধ্বনি দিয়ে লোকদের ডাকতে পারিনা? কিন্তু নবী মুহাম্মদ সা. তাও পছন্দ করলেন না। কারণ, এ পদ্ধতিতে ইহুদিরা তাদের লোকদের ইবাদতের জন্য ডাকে। ইহুদিরা হচ্ছে আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত জাতি। তাদের অনুসরণ মোটেই সঙ্গত নয়। তৎক্ষণাৎ অন্য এক সাহাবী বললেন, আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে। তা হলো আমরা নামাজের সময় একটি বড় বেল বাজাবো। আমি নিশ্চিত এই আওয়াজ সবাই শুনে সকলেই নামাজে আসতে সক্ষম হবে। নবীজি এবারও তা নাকচ করে দিলেন এই বলে, এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের পদ্ধতি আর আমরা কেন তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করব? অন্য এক সাহাবী অতি উৎসাহ নিয়ে বললেন, আমি একটি ভাল পদ্ধতি পেয়েছি। নামাজের সময় আমরা একটি বড় আগুন জ্বালিয়ে দেব। লোকেরা তা দেখে নামাজের দিকে চলে আসবে। ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা. তাতেও খুশি হতে পারলেন না। কারণ, এটি হচ্ছে অগ্নি পূজকদের পদ্ধতি। নবী মুহাম্মদ সা. কখনো অন্য কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইতেন না। ইসলামের স্বকীয়তা বজায় রাখাকেই তিনি সব সময় প্রাধান্য দিতেন। তাই তিনি সেদিন সভা সমাপ্ত করে নতুন কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। হয়তো কারো মাথায় ভালো কোন পরামর্শ আসতে পারে। অথবা আল্লাহ ওহি নাযিল করে তাকে ভালো কোন কিছু অবহিত করতে পারেন।

এদিনের মত সবাই যার যার ঘরে চলে গেলেন। আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল আনসারী রা. লোকদের সবগুলো পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এ নিয়ে চিন্তা করতে করতে তিনি তার ঘরে চলে গেলেন। সে রাতেই তিনি একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখলেন। সকালে তিনি বিলম্ব না করে নবীজির কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. আমি আজ স্বপ্নে অত্যন্ত সুন্দর একটি বিষয় দেখেছি। *"আব্দুল্লাহ তোমার সেই স্বপ্নটা কী, একটু খুলে বলো তো।"* নবী মুহাম্মদ সা. মৃদু হেসে বললেন।

আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ রা. বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, আমি তখন অর্ধঘুমে, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, সবুজ জরির পোশাক পরিহিত একজন সুন্দর মানুষ আকাশ থেকে নেমে এলো এবং আমাকে আজানের শব্দগুলো শিক্ষা দিল। সে নির্দেশ দিল এই শব্দগুলো প্রয়োগ করে যাতে আমি লোকদেরকে নামাজের জন্য ডাকি। আব্দুল্লাহ তখন তাকে স্বপ্নের মধ্যে শিখানো আজানের শব্দগুলো নবীজির সামনে খুলে বললেন। সেই শব্দগুলো ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং খুবই ভালো অর্থপূর্ণ।

সব শুনে নবী মুহাম্মদ সা. বললেন, আব্দুল্লাহ যে স্বপ্ন দেখেছে তা সত্য স্বপ্ন এবং যে লোকটি তাকে আজান শিখিয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে একজন ফেরেশতা।

নবীজির প্রিয় সাহাবী উমর রা. যখন আযানের এই শব্দগুলো শুনলেন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমিও স্বপ্নে একই ধরনের বিষয় দেখেছি হে আল্লাহর রাসূল সা.। নবীজি তাকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে কেন তুমি আমাকে আগে তা বললে না?

"আমি লজ্জা ও বিনয়ের কারণে তা আপনার কাছে বলিনি।" উমর রা. জবাব দিলেন। নবীজি উমর রা. জবাব শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। আর এটাই ছিল নবীজির সাহাবীদের অন্যতম আদব যে, তারা কখনো জনপ্রিয় হওয়ার চিন্তা করতেন না এবং প্রদর্শনেচ্ছা প্রকাশ পায় এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতেন। তারা তা শিখেছিলেন সবচেয়ে লজ্জাশীল ও বিনয়ী ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবন থেকে। যিনি ছিলেন ভদ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

নবী মুহাম্মদ সা. তখন আব্দুল্লাহকে বললেন, তুমি আযানের এই শব্দগুলো বেলালকে শিক্ষা দাও। বেলালের রয়েছে বলিষ্ঠ এবং সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর।

অতঃপর বেলাল রা. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলিষ্ঠ সুমিষ্ট কণ্ঠে প্রথমবারের মতো আজান দিলেন। বেলালের সুমিষ্ট কণ্ঠের আজান মদিনার প্রতিটি ঘরে অলিতে-গলিতে ও পাহাড়ের চূড়ায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। বিস্ময়কর আজানের এ ধ্বনি শুনে মদিনার প্রতিটি মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে এলো। এমনকি মদিনার ইহুদি এবং মূর্তিপূজারীরাও এই আযানের সুন্দর আওয়াজ শুনে হাতচকিত হয়ে উঠলো।

চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা অধীর আগ্রহে মসজিদে নববীর দিকে আসতে লাগলো। এখন থেকে আজান হয়ে গেল মুসলমানদের একটি ধর্মীয় বিষয়। এটা এমন এক অভিনব পদ্ধতি, যে পদ্ধতি কোন ধর্মের লোকেরা অনুসরণ করে না। আজানে মুয়াজ্জিন আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করে ও একত্ববাদের ঘোষণা দেয়, যা ইসলামের দাওয়াত মানুষের কর্ণকুহরে পৌঁছে দেয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম।

সেদিন থেকে বেলাল রা. ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন। আজও পৃথিবীর প্রতিটি কর্নার থেকে লোকেরা যখন আজান দেয়, তাদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে বেলালের প্রথম আজানের সেই দৃশ্য।

উপরের গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেবেন,

- *প্রাণ নাশের হুমকি থাকলে একজন মুসলিম তার ঈমানকে লুকিয়ে রাখতে পারে*
- *অবিশ্বাসীরা ইসলামকে ভয় করে, এজন্য তারা ইসলামের প্রচারে বাধা প্রদান করে। কারণ তারা তাদের নিজেদের বিশ্বাসের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত*
- *অমুসলিমরা মুসলমানদেরকে ধর্ম পালনে বাধা দিয়ে থাকে, যাতে তাদের লোকেরা ইসলামের সৌন্দর্য দেখে ইসলামের না আসে*
- *নামাজ অবশ্যই জামাতের সাথে মসজিদে সম্পন্ন করতে হবে*

- *ইসলাম প্রচারে সর্বদা নবী মুহাম্মদ সা. এর শিক্ষা দেয়া সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে*
- *মুসলিম কখনো অন্য ধর্মের ধর্মীয় বিষয়ের হুবহু অনুসরণ করবে না।*
- *মুসলমানরা অবশ্যই তাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা এবং নিজস্ব ঐতিহ্য কে ধারণ করবে*
- *আপনি যতই বুদ্ধিমান হন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে অন্যের পরামর্শ নিতে হবে*
- *পরামর্শ চাওয়া হলে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত মন খুলে পরামর্শ দেওয়া*
- *কোন বিষয়ে একাধিক পরামর্শ আসলে সর্বোত্তমটাই গ্রহণ করা হবে*
- *উত্তম পরামর্শ অনেক সময় তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকেও আসতে পারে*
- *পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল লোককে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে*
- *কিছু স্বপ্ন আছে সত্য যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে*
- *আল্লাহ ওয়ালা ও পরহেজগার লোকদের স্বপ্নের ওপর অধিক নির্ভর করা যায়*
- *ফেরেশতারা কখনো কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করেন*
- *আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অহংকারী ও প্রদর্শনেচ্ছু লোকদেরকে পছন্দ করেন না*
- *আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা জনপ্রিয় হওয়ার আকাঙ্খী নয়*
- *মোয়াজ্জিনের কণ্ঠ হবে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ*
- *বিশ্রী ও ভুল আজান একজন অমুসলিমকে ইসলামের প্রতি নিরুৎসাহিত করতে পারে*
- *আজান একান্তই মুসলমানদের নিজস্ব আহবান। যাতে আছে আল্লাহর প্রশংসা এবং অন্যদের ইসলামের দিকে আহবানের মৌলিক বাক্যসমূহ*
- *বেলাল প্রথম মুয়াজ্জিন হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন*
- *ভালো কাজে অগ্রণী ভূমিকার কারণে মানুষ আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়*

অনুশীলনী ১৭

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. আজান কি?

খ. দৈনিক কয়বার মসজিদে আযান দেওয়া হয়? এবং কেন?

গ. কেন নবী মুহাম্মদ সা. শিঙ্গা ধ্বনি, ঘন্টা বাজানো ও আগুন জালানো কে সমর্থন করেননি?

২। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও।

ক. আজানের সম্পর্ক মুসলমানের সাথে, তবে ঘন্টা বাজানোর সম্পর্ক -----------সাথে।

- ইহুদিদের
- হিন্দুদের
- খ্রিস্টানদের

খ. একজন মানুষ যখন মসজিদের পাশে থাকে, তখন সে তার সালাহ আদায় করবে--------

- ঘরে
- মসজিদে
- কাজের স্থানে

গ. মুয়াজ্জিন আজানের জন্য দাঁড়াবে ------------- হয়ে।

- কিবলামুখী
- জেরুজালেম মুখী
- মদিনা মুখী

ঘ. মোয়াজ্জিনের কণ্ঠ হবে ------ ---------।

- বলিষ্ঠ ও মিষ্টি
- ছোট ও কর্কশ
- ভদ্র ও নিচু

ঙ. আজানে আছে ----------- বড়ত্ব ঘোষণা।

- আল্লাহর
- নবীর
- ইসলামের

৩। তোমার পিতা-মাতা, অভিভাবক বা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে নিচের হাদিস দুটি পূর্ণ কর।

“যখন আজান দেয়া হয় তখন ----------- ভয়ে জড়সড় হয়ে সে স্থান থেকে পালিয়ে যায় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্থানে আবারও ফিরে আসে না যতক্ষণ না ----------শুনতে পাওয়া যায়।”

“যে স্থানে আযান দেয়া হয় সে স্থানে আল্লাহ ----------- দিয়ে দেন এবং এই স্থানটি আল্লাহর শাস্তি এবং ------------ থেকে নিরাপদ থাকে।”

পাঠ ৩
সালাত

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

ইসলামে সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটুকু

সালাত আদায়ের পূর্বশর্ত ও সালাতের বাহ্যিক বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে

নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায়কারী অন্যায় ও হারাম থেকে বিরত থাকে

সালাতের মূল প্রাণশক্তি হলো সালাত আদায়কালে আল্লাহকে স্মরণ করা

একজন মুসলিমের কাছে নামাজের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেই

সালাতে প্রবল আগ্রহ ও প্রকৃত মনযোগ দুনিয়ার কষ্টকে তুচ্ছ করে দেয়

রাসূলের অনুসরের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ ছিলেন আমাদের জন্য সর্বোত্তম নমুনা

যে সালাতে খুশু খুজু (ভীতি ও বিনয়) নেই সে সালাত প্রাণহীন ও মৃত

সালাত কি ও কেন

সালাত ইসলামের একটি বিশেষ ইবাদত। ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির মধ্যে সালাতের স্থান দ্বিতীয়। ঈমানের পরে সালাতই ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বিষয়। মুসলিম ব্যক্তিকে দিনে পাঁচবার এ ইবাদত সম্পন্ন করতে হয়। সালাত আদায়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ঈমানের পরিচয় দেয়। সালাত বান্দাকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে দেয় এবং এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না আল্লাহ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হন। সালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি জাহান্নামে শাস্তি পাবে। সালাত মুমিন ব্যক্তি কে দৈনন্দিন জীবনে সময়ানুবর্তী হতে শেখায়। জীবনে আল্লাহ পাকের পূর্ণ আনুগত্য প্রেরণা দেয়। আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি অন্যায় ও হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

সালাতের পূর্বশর্ত:

একজন মুসলিম ব্যক্তিকে সালাত শুরু করার আগে নিচের সাতটি শর্ত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

১। শারীরিক পবিত্রতা: যে অপবিত্রতা দূর করতে গোসল প্রয়োজন, সেখানে গোসল করতে হবে আর যে অপবিত্র দূর করতে অজু প্রয়োজন, সেখানে অজু করে পবিত্র হতে হবে।

২। কাপড়-চোপড়ের পবিত্রতা: যে কাপড়-চোপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা হবে, তা অবশ্যই পাক-পবিত্র হতে হবে।

৩। স্থানের পবিত্রতা: যে স্থানে সালাত আদায় করা হবে, শেষ স্থানটি অবশ্যই পাক পবিত্র হতে হবে। কোন স্থানে সন্দেহ থাকলে, সেখানে একটি পবিত্র কাপড় বিছিয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

৪। শরীর ঢেকে রাখা: একজন পুরুষকে হাঁটু থেকে নিয়ে নাভি পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। আর মহিলাদেরকে কব্জি পর্যন্ত হাত এবং মুখমণ্ডল ছাড়া বাকি পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে। শরীরের নির্ধারিত অংশের কোন একটি অংশ খোলা থাকলে নামাজ হবে না।

৫। কিবলামুখী হওয়া: নামাজি ব্যক্তিকে অবশ্যই কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে।

৬। সঠিক সময়: প্রতিটি সালাত সঠিক সময়ের ভিতরই আদায় করতে হবে। সময়ের পূর্বে কোন সালাত শুরু করলে তা আদায় হবে না।

৭। বিশুদ্ধ নিয়ত: সালাত হবে আল্লাহর জন্য। এর পিছনে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য বা লোক দেখানো মনোভাব থাকবে না। সেই সাথে নামাজি ব্যক্তিকে নিশ্চিত করতে হবে, সে কোন ওয়াক্তের কত রাকাত সালাত আদায় করছে এবং সে সালাত কি ফরজ, ওয়াজিব নাকি সুন্নাহ।

সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

১। নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে কিংবা জায়নামাজে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। দুই পায়ের পাতা সমান ভাবে পশ্চিমমুখী হয়ে থাকবে এবং এর মধ্যখানে চার থেকে আট আঙ্গুল ফাকা থাকবে।

২। মনে মনে নির্ধারণ করে নিতে হবে সেটি কোন ওয়াক্তের নামাজ এবং কয় রাকাত বিশিষ্ট নামাজ এবং তা কি ফরজ নাকি সুন্নত নাকি অন্য কিছু।

৩। দুই হাত কান বরাবর উঠবে, আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক এবং সুজা থাকবে। হাতের তালু কিবলামুখী থাকবে। এবং বলবে 'আল্লাহু আকবার'

৪। নাভি থেকে বুক পর্যন্ত যে কোন স্থানে বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখে, ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়ে বামহাত ধরবে।

৫। অতঃপর সানা পড়বে। আর তা হল:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، ولَا إِلَهَ غَيْرُكَ

৬। অতঃপর তাউস পড়া। আর তা হল:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

৭। তাসমিয়া পড়া। আর তা হল:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

৮। অতঃপর সুরা ফাতেহা পড়া।

الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

৯। তারপর যেকোনো একটি সূরা বা কমপক্ষে তিনটি আয়াত অথবা লম্বা একটি আয়াত পড়া। যেমন সূরা আসর পড়া

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

১০। আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাওয়া। দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে হাঁটু ধরতে হবে। মাথা ও পিঠ সোজাসুজি থাকবে। চোখের দৃষ্টি থাকবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে।

১১। রুকুতে নিম্নলিখিত তাসবিহ ৩ বার পড়া হবে।

سُبحانَ رَبِّيَ العَظيمِ

১২। অতঃপর سَمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ (সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলে রুকু থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

১৩। সংক্ষিপ্ত এ দাঁড়ানোতে পড়বে رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ (রব্বানা লাকাল হামদ)। একে কাওমা বলা হয়।

১৪। এবার আল্লাহু আকবার বলে আবার সেজদায় চলে যাওয়া। প্রথমে দুই হাটু ভূমি স্পর্শ করবে, এরপর দুই হাতের বাহু, তারপর নাক এবং সর্বশেষে কপাল। দুই হাতের বাহু জমিন থেকে পৃথক থাকবে এবং শরীর থেকে একটু দূরে শূন্যে থাকবে। পায়ের আঙ্গুলি কিবলামুখী থাকবে।

১৫। সেজদায় নিম্নলিখিত তাসবীহ তিনবার পড়া হবে।

سُبحانَ ربِّيَ الأعلَى

১৬। আল্লাহু আকবার বলে সেজদা থেকে বসা।

১৭। বাম পায়ের উপর বসবে ও ডান পা খাড়া থাকবে। আংগুলসমূহ থাকবে কিবলামুখী। দুই হাত দুই উরুতে থাকবে। হাতের আঙ্গুলের মাথা হাটু স্পর্শ করবে। আঙ্গুল গুলো কিবলামুখি থাকবে।

১৮। আবারও আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সেজদায় যেতে হবে।

১৯। দ্বিতীয় সেজদায়ও আগের মত তিনবার পড়তে হবে।

سُبحانَ ربِّيَ الأعلَى

২০। সেজদা শেষে আবারো আল্লাহু আকবার বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া। এর মাধ্যমে এক রাকাত নামাজ সমাপ্ত হলো।

২১। দ্বিতীয় রাকাতও প্রথম রাকাতের মত পড়তে হবে। তবে দ্বিতীয় রাকাতে ছানা পড়তে হবে না। সুরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। যেমন:

قُل هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ - ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ - لَم يَلِد وَلَم يُولَد - وَلَم يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ

২২। দ্বিতীয় রাকাতে যথারীতি রুকু এবং সেজদা দেওয়ার পর সুজা না দাঁড়িয়ে বসে থাকতে হবে। যেটাকে শেষ বৈঠক বলা হয়। সেভাবেই বসতে হবে যেভাবে দুই সেজদার মাঝখানে বসার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

২৩। এবার পড়তে হবে তাশাহুদ।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

২৪। তাশাহুদ পড়ার সময় যখন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়া হবে, তখন সাহাদত আঙ্গুলি উঠিয়ে আবার নামাতে হবে।

২৫। এবার পড়তে হবে সালাওয়াত ইব্রাহিম (বা দুরুদে ইব্রাহিম)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

২৬। দুয়া-ই ইস্তেগফার পড়া।

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অথবা এ জাতীয় এক বা একাধিক দুয়া পড়া যা নবীজি তার সালাতে পড়তেন।

২৭। সবশেষে السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ اللهِ:-বলে প্রথমে ডান দিকে এবং তারপর বামদিকে সালাম ফেরাতে হবে। ডানে বামে সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি থাকবে কাদের উপর।

দুই রাকাত বিশিষ্ট সালাত এভাবেই সমাপ্ত হয়। কিছু সালাত রয়েছে চার রাকাত বিশিষ্ট। যেমন যোহর, আসর এবং ইশার ফরজ সালাত। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাখাতে তাশাহুদ পড়ার পর সুজা দাঁড়িয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাত আগের মতই পূর্ণ করতে হবে। চতুর্থ রাখাতে ধারাবাহিকভাবে তাশাহুদ, দরুদে ইব্রাহিম এবং দোয়া-ই ইস্তেগফার পড়ে সালাত সমাপ্ত করতে হবে। তবে চার

রাকাত বিশিষ্ট সালাতের শেষের দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়তে হবে। অন্য কোন সূরা তার সাথে মিলানো লাগবে না।

ফজর, মাগরিব এবং ইশার ফরজ সালাতের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্যান্য সূরা উচ্চস্বরে পড়তে হবে। তবে যোহর এবং আসরের সালাতে তা নীরবে পড়তে হবে। সকল সালাতে তাসবিহ, হামদ, তাশাহুদ, সালাওয়াত এবং ইস্তেগফার গুলো মনে মনে পড়তে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: *শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সালাতের তাসবিহ ও অন্যান্য দুয়া দুরুদ শিক্ষা দেবেন । অতঃপর শিক্ষার্থীদের নামাজে দাঁড় করিয়ে তারা কিভাবে নামাজ পড়ছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন । ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন। এ পাঠের উপর প্রয়োজনে কয়েকটি পাঠদান করতে হবে।*

অনুশীলনী ১৮

১। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর। উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ ক. সালাত ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তৃতীয় স্তম্ভ।

☐ ☐ খ. মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করে।

☐ ☐ গ. সালাত আমাদের আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে দেয়।

☐ ☐ ঘ. সালাতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হারাম থেকে বিরত থাকে।

☐ ☐ ঙ. শারীরিক পবিত্রতার জন্য অজু প্রয়োজন, গোসল নয়।

☐ ☐ চ. পুরুষের গলা থেকে পা পর্যন্ত পুরো অংশ ঢাকা আবশ্যক।

☐ ☐ ছ. সময়ের পূর্বে কোন সালাত শুরু করলে তা আদায় হবে।

☐ ☐ জ. সালাতে দুই পায়ের মধ্যখানে এক থেকে দুই হাত ফাঁকা থাকবে।

☐ ☐ ঝ. সকল সালাতে তাসবিহ ও দুয়াগুলো মনে মনে পড়তে হবে।

☐ ☐ ঞ. প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়তে হবে।

☐ ☐ ট. রাতের সালাতে কুরআন উচ্চস্বরে পড়তে হয়।

☐ ☐ ঠ. রুকু ও সেজদায় তাসবীহ পাঠ করতে হবে দুইবার করে।

হাদিসের গল্প
সালাতে খুশু-খুজু ও সাহাবীগণ

সালাত আল্লাহর সঙ্গে মুমিন ব্যক্তি কথোপকথন। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, *'তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে!'*। আল্লাহ হলেন মহা বিশ্বের স্রষ্টা ও একক অধিপতি। তিনি দুনিয়ার সকল শাসক ও রাজা-বাদশারও রাজা। দুনিয়ার সাধারণ রাজা বাদশার সামনে দাঁড়ালে মানুষ ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে দাঁড়ায়। তাহলে আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে কেমন হওয়া উচিত আমাদের অবস্থা! অবশ্যই আমাদের উচিত ভয়-ভীতি ও বিনয় নম্রতা সহকারে দাঁড়ানো। উচিত, আদাব রক্ষা করে আল্লাহর সাথে কথা বলা। এমনভাবে সালাত আদায় করা, যেন আল্লাহ আমাদের দেখছেন।

সাহাবীগণ সকল কাজে নবীজির পূর্ণ অনুসরণ করতেন। সালাতে মনযোগ কিভাবে রাখতে হয় তারা তা আয়ত্ত করেছিলেন। তারা নবীজির কাছ থেকে শিখেছিলেন কিভাবে সালাতে পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করতে হয়। তাই তারা সর্বাবস্থায় ভীতি ও বিনয় সহ সালাতে আদায় করতেন। যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তেও তারা তাদের সালাতে গাফলতি করতেন না ও দুর্বলতা দেখাতেন না। সালাতকে তারা দুনিয়ার যে কোন কাজের উপর অগ্রাধিকার দিতেন ও সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে আদায় করতেন। এমনকি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর শরীরে বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নামাজে পূর্ণ খুশু বজায় রাখতেন।

সাহাবী জাবের রা. বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সা. এর সঙ্গে জাতুর-রিকা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন আমাদের এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের সঙ্গীকে হত্যা করে। ফলে ঐ মুশরিক শপথ করে বসে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সা. এর কোনো সঙ্গীকে হত্যা না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিরত হব না। সে নবী সা. এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নবী মুহাম্মদ সা. ও মুশরিকদের পক্ষ হতে গোপন আক্রমণের আশংকা করলেন। তাই নবী সা. এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। সাহাবীগণ নবীজিকে পাহারা দেয়া ও তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়াকে নিজেদের জীবনের চাইতে বেশি পছন্দ করতেন। তারা এ কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতেন। নবী মুহাম্মাদ সা. বললেন, তোমরা দু'জন গিরিপথের চূড়ায় মোতায়েন থাকবে। তখন উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছলে মুহাজির সাহাবি ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারী সাহাবি দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে মশগুল হয়ে পড়েন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সলাতে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় মুশরিক লোকটি এসে দূর থেকেই আনসারী সাহাবিকে দেখে চিনে ফেলল। সে বুঝতে পারল, তিনি নিরাপত্তা প্রহরী। সে তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল, যা তার শরীরে এসে বিঁধে গেল। কিন্তু আনসারী সাহাবী সালাত ভঙ্গ না করে এক হাত দিয়ে তীরটি বের করে নিলেন। মুশরিক ব্যক্তি একে একে তিনটি তীর

নিক্ষেপ করল। তিনি শান্তভাবে রুকু সিজদা করে যথারীতি সালাত শেষ করলেন। অতঃপর তার সঙ্গী মুহাজির সাহাবীকে জাগালেন। মুহাজির সাহাবি জেগে উঠে দেখলেন তার সঙ্গীর শরীর রক্তাক্ত। তাকে এ অবস্থায় দেখে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই আমাকে ডাকেননি কেন? তিনি বললেন, আমি সালাতে এমন একটি সুরা তেলাওয়াত করছিলাম, যা ছাড়তে আমি পছন্দ করিনি। তাই সালাত শেষ করেই আপনাকে জাগালাম।

সাহাবায়ে কেরামের সালাতের এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাদের সালাত ছিল সত্যিকার অর্থেই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আমাদের সলাতেও যেন এমন খুশু-খুজুর (ভীতি ও বিনয়) অনুভূতি আসে সে চেষ্টা করতে হবে। যারা এমন সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাদের জন্য সফলতার সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, *'সফলকাম সেসব মুমিন, যারা তাদের সলাতে খুশু-খুজু (ভীতি ও বিনয়) অবলম্বন করে।'* (সুরা মুমিনুন:১-২)

উপরের গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেবেন,

- *সালাতের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহকে সন্তুষ করা ও সালাত আদায়কালে মন থেকে দুনিয়ার সকল চিন্তা দূর করে, কী পড়া হচ্ছে তার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে*
- *সালাত আদায়কালে মনে করতে হবে, আসমান জমিনের বাদশা মহা ক্ষমতাধর আল্লাহর সামনে এক অসহায় গোলাম দাঁড়িয়ে আছে*
- *দুনিয়ার যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়িত্বের উপর সালাত আদায়কে অগ্রগাধিকার দিতে হবে*
- *আল্লাহর রাসূল সা. যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতেন আমাদেরকেও সেভাবে আদায় করতে হবে*
- *সালাতের পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি পেতে হলে সালাতকালীন সময়ে অন্তরে আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর প্রতি বিনয় থাকতে হবে*
- *সাহাবীগণ সালাতকে দুনিয়ার যে কোন কাজের উপর অগ্রাধিকার দিতেন ও সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে আদায় করতেন, এমনকি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর শরীরে বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নামাজে পূর্ণ খুশু বজায় রাখতেন*
- *ভালো ও কল্যাণকর কাজে সর্বদা এগিয়ে থাকে হবে ও অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে*
- *সালাত ধীর স্থির ভাবে আদায় করতে হবে এবং তাড়াহুড়া করা যাবে না*
- *শত্রু সম্পর্কে গাফেল থাকা মোটেই সঙ্গত নয়, বরং সদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে, প্রয়োজনে পাহারা দিতে হবে*
- *কুরআনের অর্থ বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করলে নামাজে এমন আকর্ষণ হতে পারে যা দুনিয়াবী কষ্টকে ভুলিয়ে দিতে পারে*
- *সালাতের পূর্ণ সওয়াব ও ফলাফল পেতে হলে পূর্ণ একাগ্রতা, আল্লাহভীতি ও বিনয় নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে*
- *সালাতে খুশু খুজু (ভীতি ও বিনয়) অবলম্বনকারী মুমিন বান্দাদের আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন ও তাদের জন্য সর্বোচ্চ জান্নাত নির্ধারণ করেন*

পাঠ ৪
ঈদ আল-ফিতর ও ঈদ আল-আযহা

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

ইসলামে ঈদের মর্যাদা ও গুরুত্ব কতটুকু

উৎসব শারীরিক আনন্দ, আত্মার উৎকর্ষতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার মাধ্যম

আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা প্রমাণ করতে হয়

মুসলিমদের জন্য বৎসরে কেবল দুটি ঈদ: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা

মুসলমানগণ তাদের উৎসবগুলো সেভাবেই পালন করে যেভাবে তারা নির্দেশিত

ঈদ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত এবং একটি সুন্দর উৎসব

ঈদ হচ্ছে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়ার মাধ্যম

ঈদ

ঈদ মানে আনন্দ ও হাসি-খুশি। ঈদের দিনে মুসলিমগণ সম্মিলিত ভাবে আনন্দ উৎসবে যেতে উঠে। নিত্যনতুন ও সুস্বাধু খাবার সবাই উপভোগ করে। সুন্দর ও উন্নত পোষাক পরে শিশু-বুড়ো সকলে ঈদগাহে মিলিত হয়। কারো মনে নেই কোন সংকীর্ণতা। নেই ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ। একে অপরকে বুকে জড়িয়ে আপন করে নেয়। সমাজের সকলে মিলে মিশে যেন এক বিশাল পরিবার। ঈদগাহে সকলে একসাথে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে সালাত আদায় করে। ইমাম সকলের উদ্দেশ্যে খুৎবা দেন এবং তাতে ঐক্য, ভাতৃত্ত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলকে আহ্বান জানান। ঈদ সত্যিই আমাদের জীবনে নিয়ে আসে আনন্দের বন্যা। আর আমাদের আত্মা প্লাবিত হয় আল্লাহর প্রতি ভক্তি, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার জোয়ারে। মুসলমানদের ঈদ যেমন শারীরিক আনন্দ যোগায় তেমনি তা মন ও আত্মার উৎকর্ষতা সাধন করে। ঈদের মূল আনন্দ হল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার ও ক্ষমা লাভ।

মুসলমানদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূল সা. বৎসরে দুটি ঈদ তথা আনন্দ উৎসব নির্ধারণ করেছেন। তার একটি ঈদুল ফিতর আর অন্যটি হল ঈদুল আজহা।

১। ঈদুল ফিতর: এটা হল রমজানের রোজা ভাঙ্গার ঈদ। রমজান মাসে প্রতিদিন ভোররাত হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানগণ রোজা রাখেন। রাতে তারা আদায় করেন দীর্ঘ তারাবির সালাত। আল্লাহর প্রতি দিনরাত আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের এক ভরা মৌসুম হল রমজান মাস। রমজান মাসের শেষে শাওয়ালের প্রথম দিন। এই দিনে আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণ একমাস রোজা ও ইবাদতের পুরস্কার প্রদান করেন। পুরস্কার গ্রহণের এই দিনটি হল 'ঈদুল ফিতর'। মুসলিমরা পুরস্কার পেয়ে আনন্দে মেতে উঠে ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এ দিনে সবাই মহা খুশি। শিশুরা মেতে উঠে আনন্দ উৎসবে। বড়রা তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে

বেড়াতে যায় এবং শিশুদেরকে উপহার প্রদান করে। আর মৃত ব্যক্তিদের কবরস্থান ভ্রমণের মাধ্যমে তাদের জন্য দুয়া দরুদ ও কল্যাণ কামনা করে।

ঈদুল ফিতরের দিনে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা দরিদ্র ও অভাবীদের নির্ধারিত হারে সাহায্য প্রদান করে। এ সাহায্যকে বলা হয় 'সাদকাতুল ফিতর'। এ সাদকার অর্থ দিয়ে অভাবী লোকেরা ঈদ উদযাপন করে। ঈদুল ফিতর হল ধনী গরিব সকলের জন্যই হাসিখুশি ও উল্লাসের দিন।

২। ঈদুল আযহা: কুরবানীর ঈদ। ঈদুল আযহা উদযাপিত হয় জিলহজ মাসের ১০ তারিখে। জিলহজ হল ইসলামের অন্যতম ভিত্তি হজের মাস। ঈদুল আজহার অন্যতম কাজ হল পশু কোরবানি। এ ঈদের সাথে নবী ইব্রাহিম আ. এর স্মৃতি জড়িত। নবী ইব্রাহিম আ. কে আল্লাহ তার প্রিয় সন্তান কোরবানির নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রিয় পুত্র ইসমাইল আ. কে কুরবানি করতে পূর্ণ প্রস্তুত তখন আল্লাহ একটি বেহেশতী দুম্বা তার সামনে হাজির করলেন। নবী ইব্রাহিম আ. তখন আল্লাহর নির্দেশে সন্তানের বদলা দুম্বা কুরবানি করলেন।

নবী ইব্রাহিম আ. আল্লাহর প্রতি তার যে ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছিলেন, তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে এই ঈদ। এটা শিক্ষা দেয় মুসলমানরা সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, এমনকি নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকেও।

ঈদুল আযহার দিনে মুসলমানরা খুব ভোরে সম্মিলিতভাবে দু'রাকাত সালাত আদায় করে। ধনীরা সালাত আদায়ের পর একটি পশু কুরবানি করে। তারা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছাগল, ভেড়া, গরু কিংবা উট কুরবানি দেয়। আর সেই কোরবানির গোশত নিজেরা খায় এবং আত্মীয় ও দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়। ঈদুল আজহায় অন্যান্য মজাদার খাবারের পাশাপাশি কোরবানির গোশতও খাওয়া হয় আনন্দঘন পরিবেশে।

ঈদের আনন্দ উৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জান্নাতের মহা উৎসবের কথা। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ আনন্দে মেতে থাকবে চিরস্থায়ী জান্নাতের রাজকীয় উৎসবে।

অনুশীলনী ১৯

১। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর। উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ ক. ঈদ মানে হচ্ছে আনন্দ ও হাসি-খুশি।

☐ ☐ খ. বৎসরে একটিমাত্র ঈদ উদযাপিত হয়।

☐ ☐ গ. মুসলমানগণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈদ উদযাপন করে।

☐ ☐ ঘ. ঈদ হল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার লাভ।

☐ ☐ ঙ. ঈদুল আযহা রমজান মাসের শেষে উদযাপিত হয়।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ চ. মুসলমানরা ঈদের আনন্দ প্রকাশ করে নাচ গানের মাধ্যমে।

☐ ☐ ছ. ঈদের দিনে প্রত্যেকেই তাদের সর্বোত্তম জামা কাপড় পরিধান করে।

☐ ☐ জ. ঈদের দিনে আত্মীয় বাড়িতে বেড়ানো এবং শিশুদেরকে উপহার দেয়া হয়।

☐ ☐ ঝ. নূহ আঃ তার সন্তানকে কুরবানি করতে নির্দেশিত হয়েছিলেন।

☐ ☐ ঞ. আল্লাহ কোরবানির পশু থেকে প্রচুর গোশত এবং রক্ত চান।

☐ ☐ ট. পশু কোরবানির মাধ্যমে মূলত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দেয়া হয়।

☐ ☐ ঠ. ঈদ উদযাপন স্মরণ করিয়ে দেয় জান্নাতের মহা আনন্দ উৎসবের কথা।

হাদিসের গল্প
বিশ্ব নবীর ঈদ উদযাপন

মক্কায় মুসলমানগণ কঠিন সময় অতিবাহিত করেছেন। তাদের নিয়মিত ইবাদতও অনেক গোপনে আদায় করতে হতো। তারপর হিজরত করে মুসলমানগণ মদিনায় এলেন। মদিনার পরিবেশ ছিল ইসলাম পালনের অনুকূল। মদীনায় আসার পর নবী মুহাম্মদ সা. দেখলেন, সেখানকার লোকজন দুটি দিনকে উদযাপন করে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব তোমরা কী করছো ? তারা বললো, আমরা জাহেলী যুগে এ দু'দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ করতাম। তাই এখনো করছি। নবী মুহাম্মদ সা. তাদের বললেন, তোমরা তো এখন কেবল খেলাধুলা ও আমোদ-ফূর্তি করছো। আল্লাহ তোমাদের জন্য তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটি দিন দিয়েছেন। যা হল ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর। যে দুটি ঈদে আনন্দ ফুর্তি ও খেলা-ধুলা তো আছেই, সেই সাথে আছে আল্লাহর শুকরিয়া ও আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার ও ক্ষমা। ঈদ ঊদযাপন একদিকে আমাদের দেবে অনাবিল পার্থিব আনন্দ, অপরদিকে আমরা পাবো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা, যা পরকালীন মুক্তির সোপান।

মদিনার কোন এক ঈদের সকাল। চারিদিকে বইছে ঈদের আমেজ। লোকজন আনন্দ ভাগাভাগি করছে। নারী পুরুষগণ ঈদ আনন্দে নিজ নিজ অনুভূতি ব্যক্ত করছিল। ছোট্র সোনামনিরা নতুন জামা পড়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। তাদের হৈ-হুল্লোড় প্রিয় নবী সা. স্বচক্ষে দেখছিলেন। এমনকি নবীজির ঘরে আয়েশা রা. এর নিকটে বসে দুটি ছোট মেয়ে গজল গাচ্ছিল। নবীজি তা দেখেও তাদের কিছু বলেন না। তিনি যেন চাচ্ছিলেন তারা এসব করুক। ইতিমধ্যে আবু বকর রা. নবীজির ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ছোট্ট মেয়ে দুটিকে এসব বন্ধ করতে বলেন। নবী সা. তার কথা শুনে বললেন, '*মেয়ে দুটিকে গাইতে দাও*'।

অন্যদিকে প্রিয় নবীর হুজরার খুবই নিকটে আরেকটি অনুষ্ঠান চলছিল। ঈদ উপলক্ষে আবি সিনিয়ার কিছু লোকজন লাঠি-শোঠা নিয়ে খেলাধুলা করছিল। নবী সা. হযরত আয়েশা রা. কে ডেকে বললেন, *"আয়েশা তুমি কী দেখতে চাও?"* আয়েশা বললেন, *"হ্যাঁ"*। অতঃপর নবীজি আয়েশা রা. কে তার পিছনে রেখে নিজ কাঁধের উপর দিয়ে তা উপভোগ করতে দেন। নবীজি নিজেও খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়ে বললেন, *"হে বনি আরফেদা, তোমরা শক্ত করে ধরো। আয়েশা রা. ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।"*

অপর আরেক অনুষ্ঠানে কিছু বালক নবী সা. এর শানে উচ্চাঙ্গের ও মানসম্পন্ন কবিতা আবৃতি করতে লাগল। তারা ছিল ভিন্ন ভাষাবাসী বালক। তারা তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কবিতাগুলো আবৃতি করছিল। তাই নবী করীম সা. তাদেরকে কবিতার অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাকে বলা হল, তারা বলছে, *'মুহাম্মদ সা. সৎ ও নেককার বান্দা'*।

উপরের গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেবেন,

- *ইসলামে ঈদ একটি সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রতীক, যা দেহ ও মনের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়*
- *ইসলাম মানব প্রকৃতিকে সম্মান জানায় ও বৈধ সকল চাহিদা পূরণের সুযোগ দেয়*
- *ঈদে সকল বয়স ও শ্রেণীর মানুষের আনন্দ উল্লাসের ব্যবস্তা থাকতে হবে*
- *ইসলামে অন্য জাতি ধর্মের উৎসবের বিপরীত নিজ উৎসব রয়েছে, যা অন্যদের চেয়ে উত্তম*
- *লোকদের অবৈধ উৎসব থেকে বিরত রাখতে ইসলামে বৈধ উৎসবের ব্যবস্থা রয়েছে*
- *শরীয়তের সীমার ভিতর থেকে খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করা শুধু বৈধ নয় বরং প্রয়োজন*
- *ঈদ উৎসব ইসলামের একটি প্রতীক, যাতে নারী ও শিশু সহ সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে*
- *স্বামী-স্ত্রী আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মধ্যদিয়ে আনন্দ উৎসব উপভোগ করবে*
- *স্বামীর উচিত মাঝে মধ্যে স্ত্রীর জন্য বৈধ আনন্দ ও হাসিখুশির ব্যবস্থা করা*
- *স্ত্রীর উচিত সকল কাজে স্বামীর অনুমতি নেয়া, এমনকি যে কোন বৈধ আনন্দ অনুষ্ঠানে যেতেও*
- *খেলাধুলায় ব্যস্ত হওয়ার সময় অবশ্যই শরীয়তের সীমারেখার ভিতর থাকতে হবে*
- *কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে অথবা আল্লাহর বিধান নষ্ট করে কখনও খেলাধুলা করা যাবে না*
- *নাবালেগ মেয়েদের সীমিত পরিসরে গান গাওয়া বৈধ, তবে একে পেশা হিসেবে নেয়া অনুচিত*
- *ঈদে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যেমন নাশিদ সন্ধ্যা, কবিতা আবৃত্তি ও গল্পবলার ব্যবস্থা করা যাবে*
- *শিশুদের নানামুখী প্রতিভা বিকাশের জন্য ঈদ উপলক্ষে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে*

আদ'ইয়্যাত ও আদাব
(দুয়া দুরুদ ও শিষ্টাচার)

শিক্ষক ও অভিভাবক:

আদ'ইয়্যাত

আদ'ইয়্যাত শব্দটি আরবি। একবচনে দুয়া । দুয়া অর্থ হল প্রার্থনা। আল্লাহর এক নগণ্য দাস তার সৃষ্টিকর্তার কাছে তার নিজ প্রয়োজন কিংবা দাসত্ব প্রকাশ করাকেই দুয়া বলে। সৃষ্টিকর্তার কাছে এ জাতীয় আবেদন বা অনুনয় বিনয় এক প্রকার ইবাদাত। আল্লাহ হচ্ছেন চিরন্তন সত্তা। তিনি সব কিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। তার ইচ্ছা বাস্তবায়নে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। একমাত্র তিনিই বান্দার সকল প্রয়োজন বিনা বাধায় পূরণ করতে পারেন। আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস বান্দাকে তার মুখাপেক্ষী হতে উৎসাহিত করে, তার কাছে সব সমস্যা খুলে বলতে প্রেরণা যোগায়। বান্দা তার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য তার কাছেই ফিরে যায়।

দুয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি কিংবা কোন নির্দিষ্ট ভাষার প্রয়োজন নেই। বান্দা যে কোন সময়, যে কোন উপায়ে, যে কোনো ভাষায় তার স্রষ্টার কাছে তার মনের আকুতি পেশ করতে পারে। কোন প্রার্থনা যদি বান্দার মনের গহীনে উদয় হয়, সেটাও আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। কোন বিলম্ব ছাড়াই আল্লাহ তার বান্দার প্রার্থনা শুনতে এবং তার জবাব দিতে পারেন। আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোন শেষ নেই। যত বেশিই চান, তিনি কখনো বিরক্ত হবেন না। যে আল্লার কাছে যত বেশি প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ততই বেশি পছন্দ করেন, সে আল্লাহর ততো ঘনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হয়। প্রকৃত বান্দার উচিত সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর কাছে দুয়া এবং প্রার্থনা অব্যাহত রাখা।

দুয়ার গুরুত্বের ব্যাপারে কোরআনের এই বর্ণনাই যথেষ্ট: হে মুহাম্মদ ! লোকদের বল, আমার রবের তোমাদের কি প্রয়োজন, যদি তোমরা তাকে না ডাকো। (সূরা ফুরকান: ৭৭)

দুয়া মুমিন ব্যক্তির অন্যতম একটি গুণাবলি যা তাকে একজন কাফির থেকে পৃথক করে। দুয়া একজন ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ।

অনেক লোক বিশ্বাস করে গোটা বিশ্ব জাহান তার আপন গতিতেই চলছে। তার উপর কারো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু তারা এটা জানেনা যে, এই বিশ্ব জাহানের সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একজন সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে। সকল সৃষ্টির ভাগ্য আল্লাহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ইমানদার ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে যে যিনি তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, কেবল তার কাছে প্রার্থনার মাধ্যমেই তার প্রাপ্য সে নিয়ে আসতে পারে। তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক।

তবে এটাও জেনে রাখা উচিত যে, যা কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়া হবে সবকিছুই তাৎক্ষণিক পাওয়া যাবেনা। আমরা আল্লাহর কাছে যা কিছু চাই তা আমাদের জন্য কল্যাণকর না কি অকল্যাণকর তা অনেক সময় আমরা জানি না। কি কল্যাণকর এবং কি কল্যাণকর নয় তা আমাদের চেয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। আমাদের কিছু চাওয়া তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ না করে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলা তার বদলা অন্যভাবে দিয়ে দেন।

দুয়া হবে বিনয় ও নম্রতার সাথে একান্ত পরিবেশে। আর দুয়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সে আশাও থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে দুয়া করে আমরা বুঝাচ্ছি যে, আল্লাহ আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন।

আমরা চাইলেও সব কাজ নির্ভুলভাবে করতে পারি না। কেবল তখনই পারি যখন আল্লাহ চান। আল্লাহর কাছে দুয়া না করা এক প্রকার গর্ব বা অহংকার। আমার কাজ আমি করতে পারি, কার কাছে আমি চাইবো? এ মনোবৃত্তিকে আল্লাহ খুবই অপছন্দ করেন। দুয়া হচ্ছে বান্দার শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম একটি সোপান । দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও মুক্তি লাভের আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম উপায়।

আদাব

নবী মুহাম্মদ সা. তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচারের সর্বোত্তম আদর্শ উপস্থাপন করতেই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" তার আগমনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল, একজন মানুষকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বোত্তম চরিত্রের ও শিষ্টাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যে সমস্ত গুণাবলি নিয়ে জন্মায় সেগুলোর উন্নতি ও বিকাশ সাধনই তার জীবনের অন্যতম করণীয়। অপরপক্ষে সৃষ্টিগতভাবে প্রাপ্ত দুর্বলতা ও অসৎ গুণাবলির বিলোপ সাধন করা তার কর্তব্য। খারাপ গুণাবলি ও অভ্যাস মানব হৃদয়ের জন্য মরিচার মত। এ মরিচা দূরকরণের অন্যতম উপায় হল সৎ গুণাবলির বিকাশ সাধন ও অসৎ গুণাবলিকে যথাসাধ্য পরিমার্জন করে তার থেকে উপকার গ্রহণ করা। উত্তম গুণাবলির বিকাশে ও অসৎ গুণাবলির পরিমার্জিনে যে অপূর্ণতা থেকে যাবে তার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তার কাছে তাওবা করাই একমাত্র উপায়।

সৎ গুণাবলির বিকাশ সাধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ সা. এর এ কথা স্মরণ রাখা যে, "উত্তম আমল হল তা যা নিয়মিত করা হয় যদিও তা খুবই তুচ্ছ এবং নগণ্য"। তাই প্রতিদিন কোন না কোনভাবে আমাদেরকে ভাল কাজ করতে হবে, আদাব ও শিষ্টাচারের প্রতিটি ছোটখাট বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেবল এভাবেই আমরা পারি আমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা উন্নত গুণাবলিকে বিকশিত করতে ও অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্বলতাকে প্রসংশনীয় পর্যায়ে উন্নীত করতে।

পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা

"শিশু মনে দ্বীনের আলো ২" বইয়ে যেসব দুয়া শেখা হয়েছে নতুন পাঠ শুরুর পূর্বে তা অবশ্যই পুনরালোচনা করতে হবে।

কালিমা তাইয়্যেবাহ

لآ اِلَهَ اِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْل اللّهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল"

কালিমা শাহাদাহ

اشْهَدُ انْ لّآ اِلَهَ اِلَّا اللّهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরিক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল"।

ঈমানে মুজমাল (ঈমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِه وَصِفَاتِه وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِه

"আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, যেভাবে তিনি তার নাম সমূহ এবং গুণাবলির দ্বারা (বিদ্যমান আছেন) আর আমি তার সকল বিধানাবলি কে মনে প্রাণে গ্রহণ করলাম।"

ঈমানে মুফাস্সাল (ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ)

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ

"আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাগণের প্রতি, তার নাযিলকৃত কিতাব সমূহের প্রতি, তার প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, তাকদিরের প্রতি, যার ভালো এবং মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং মৃত্যুর পরে পুণরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।"

খাওয়ার শুরুতে দুয়া

بِسْمِ اللَّهِ

'আল্লাহর নামে (শুরু করলাম)'

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ার দুয়া

بسمِ اللَّهِ فِي أوَّلِهِ وآخرِهِ

'ইহার (খাওয়ার) শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে।'

খাওয়ার শেষে দুয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের খাওয়ালেন এবং পান করালেন আর আমাদের করেছেন মুসলিম।'

ঘুমানোর পূর্বের দুয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

'হে আল্লাহ! তোমার নামে (সাময়িকভাবে) মরে যাচ্ছি এবং তোমার নামেই জীবিত হব'

ঘুম থেকে ওঠার পরে দুয়া

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ যিনি আমাদেরকে (সাময়িক)মৃত্যু দানের পর আবার জীবন দান করলেন আর তার কাছেই আমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে'।

এক মুসলিম আরেক মুসলিমের সাক্ষাতে বলবে

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

অর্থ: আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

উত্তরে অপর মুসলিম বলবে

وَعَلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ وَرَحْمَةُ ٱللَّٰهِ

অর্থ: আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত

কারো হাঁচি আসলে বলবে

الـحَمْدُ للَّـهِ

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর ।’

হাঁচির দুয়া ‘আলহামদুলিল্লাহ’ শুনলে বলবে

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

‘আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন ।’

প্রতি উত্তরে হাঁচি দাতা বলবে

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، ويُصْلِحُ بَالَكُمْ

‘আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করে দিন ।’

কাউকে ধন্যবাদ জানাতে বলা

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক অভিব্যক্তি

১। কোন কিছু শুরু করার সময় বলবে

بِسْمِ اللّٰهِ

‘আল্লাহর নামে শুরু করলাম’।

২। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য’।

৩। আশ্চর্য জনক কিছু ঘটে গেলে বলবে

سُبْحَانَ اللهِ

'আল্লাহ পরিপূর্ণ ও পবিত্র'।

৪। আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে বলবে

اللَّهُ أَكْبَرُ

'আল্লাহ মহান'।

৫। ভবিষ্যতে কিছু করার ইচ্ছে করলে বলবে

إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ

'যদি আল্লাহ চাহেন'।

৬। কিছু অর্জিত হলে বলবে

مَا شَاءَ ٱللَّٰهْ

'যেভাবে আল্লাহ চেয়েছেন সেভাবে হয়েছে'।

৭। কারো কল্যাণ কামনা করতে বলবে

بَارَكَ ٱللَّٰهُ فيك

'আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন'।

৮। কোন বিষয়ে অনুশোচনা পেশ করতে বলবে

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই'।

পাঠ ১-৭
আদ'ইয়্যাত ও আদাব

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে*দুয়া এবং অন্যান্য ইসলামিক অভিব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণের একটি অন্যতম উপায়*

মুমিন ব্যক্তির কোন একটি মুহূর্তও দুয়া ছাড়া অতিবাহিত হবে না

আমরা যা চাই তা কেবল পেতে পারি তখন, যখন আল্লাহ আমাদের জন্য তা অনুমোদন করেন

দুয়া আমাদের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করে এবং আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আসে

দুয়া হল আমাদের দুর্বলতার স্বীকৃতি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের একটি উত্তম উপায়

দুয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি তার নিজের মধ্যে লুকায়িত গুণাবলির বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হবে

উত্তম গুণাবলি বিকাশের অন্যতম উপায় হল প্রতিদিন কিছু না কিছু ভালো কাজের অভ্যাস করা

পাঠ ১
ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার দুয়া

আমাদের বিশ্রাম, খাওয়া দাওয়া ও আরাম-আয়েশের স্থান হল আমাদের ঘর। যে ঘরে আল্লাহর জিকির হয় ও আল্লাহর নাম নেয়া হয় সে ঘর শান্তির স্থান। পক্ষান্তরে যে ঘরে আল্লাহর নাম নেয়া হয়না সে ঘরে শয়তান অবস্থান করে ও ঘর থেকে শান্তি চলে যায়। ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম নেয়া হলে শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। আবার ঘর থেকে বাহির হওয়ার সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তবে আল্লাহ আমাদের বিপদ মুসিবত ও দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ রাখবেন। আল্লাহর রহমতে ব্যক্তি শয়তানের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা পাবে। তাই আমাদের উচিত ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

ঘরে প্রবেশের পূর্বের দুয়া হল

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

“হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহ্র উপর, যিনি আমাদের রব তাঁর ভরসা করছি।”

ঘর থেকে বের হওয়ার দুয়া হল

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

“আল্লাহর নামে বের হলাম, আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া কোন উপায় নেই, ক্ষমতা নেই।”

ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পালনীয় সুন্নাহ আদাব সমূহ হল:

১। ঘরে প্রবেশের সময় ঘরের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া।

২। ডান পা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা এবং বাম পা দিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া।

৩। ঘরে প্রবেশকালে কারো ঘুমে ব্যাঘাত হয় এমন উচ্চস্বরে সালাম বা শব্দ না করা

৪। অন্যের ঘরে প্রবেশের আগে অবশ্যই তাদের অনুমতি চাওয়া।

৫। ঘর থেকে ‘আপনি কে’ জানতে চাইলে, উত্তরে ‘আমি’ না বলে পূর্ণ নাম বলা।

৬। তিনবার সালাম ও অনুমতি চাওয়ার পর উত্তর না আসলে ফিরে চলে যাওয়া।

৭। দরজা থেকে ডানে অথবা বামে সরে অনুমতি চাওয়া, যাতে সরাসরি ঘরের ভেতর চোখ না যায়।

অনুশীলনী ২০

১। নিচের ঘরে রাখা শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর ।

উচ্চস্বরে	সালাম	সরে	তিনবার	ডান	অনুমতি	আমি

ক. ঘরে প্রবেশের সময় ঘরের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে --------- দেওয়া উচিত।

খ. ঘরে প্রবেশের সময় -------- পা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা উচিত।

গ. ঘরে প্রবেশকালে কারো ঘুমে ব্যাঘাত হয় এমন -------- সালাম দেয়া ঠিক নয়।

ঘ. অন্যের ঘরে প্রবেশের আগে অবশ্যই তাদের ------ চাইতে হবে।

ঙ. ঘর থেকে 'আপনি কে' জানতে চাইলে, উত্তরে --------- না বলে পূর্ণ নাম বলা উচিত।

চ. ------- সালাম ও অনুমতি চাওয়ার পর উত্তর না আসলে ফিরে যেতে হবে।

ছ. দরজা থেকে ডানে অথবা বামে --------- অনুমতি চাওয়া উচিত।

পাঠ ২

আয়নায় দেখা ও কাপড় পরিধানের দুয়া

মানুষ আল্লাহর সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি। সেই সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে চেহারায়। আর পোশাক পরিচ্ছদ মানুষের শারীরিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে। মানুষের উচিত তার সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের যত্ন নেয়া ও তার সুরক্ষা করা। তবে মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য তার নৈতিক চরিত্রের মধ্যে নিহিত। তাই সকলকে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন করতে হবে।

আয়নায় চেহারা দেখার দুয়া

اَللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছো; কাজেই (এভাবে) আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও"।

পোশাক পরিধানের দুয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

“সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে কাপড় পরিয়েছেন, যা দিয়ে আমি লজ্জাস্থান ঢেকে রাখি এবং জীবনে সৌন্দর্য লাভ করি”।

আয়নায় দেখা ও পোশাক পরিধান করার সময় পালনীয় সুন্নাহ আদাব সমূহ হল:

১। চেহারা দেখে অহংকারী না হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা।

২। আয়নার সম্মুখে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করা।

৩। লোক চক্ষুর আড়ালে পোশাক পরিবর্তন করা।

৪। পোশাক খোলার সময় বাম দিক প্রথমে খোলা।

৫। পোষাক পরিধানের সময় প্রথমে ডান দিক করা।

৬। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা।

৭। অবশ্যই রুচিসম্মত ও শালীন পোষাক পরিধান করা।

৮। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা।

৯। পুরুষের পাজামা অবশ্যই টাকনুর নিচে যাবে না।

অনুশীলনী ২১

১। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর। উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ ক. আয়নার সম্মুখে যতক্ষণ ইচ্ছা সময় ব্যয় করতে পারো।

☐ ☐ খ. লোক চক্ষুর আড়ালে কাপড় পরিবর্তন করা উচিত।

☐ ☐ গ. কাপড় খোলার সময় প্রথমে ডান দিক খোলা উচিত ।

☐ ☐ ঘ. কাপড় পরিধানের সময় প্রথমে বাম দিক পরিধান করা।

☐ ☐ ঙ. সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র পোশাক পরিধান করা।

পাঠ ৩
অসুস্থতা এবং শারীরিক ব্যথার দুয়া

সুস্থতা আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা। অসুস্থতা আনে এমন সকল কাজ বর্জন করা। তবে অসুস্থ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে সুস্থতার দুয়া করা উচিত। আর অন্য মুসলিম ভাই অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া উচিত।

শারীরিক ব্যথা উপশমের দুয়া

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"আমি আমি যা অনুভব ও আশংকা করি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ ও তাঁর শক্তির নিকট আশ্রয় চাই।"

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দুয়া

لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- اللَّهُمَّ اشْفِيه اللَّهُمَّ عَافِيه

"কোন অসুবিধা নেই, তুমি সুস্থ ও পবিত্র হবে, দুশ্চিন্তার কারণ নেই, আশা করি সুস্থ ও পবিত্র হবে। হে আল্লাহ তাকে আরোগ্য করুন, হে আল্লাহ তাকে সুস্থ করুন।"

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার সময় করণীয় সুন্নাহ আদব সমূহ হল:

১। রোগীকে উৎসাহ ও সাহস দেয়া, হতাশ না করা।

২। রোগী দেখার সময় যথাসম্ভব কম সময় ব্যয় করা।

৩। রোগীর সামনে এমন কোন উচ্চবাচ্য না করা যা তাকে কষ্ট দেয়।

৪। কেউ অসুস্থ হলে দেরি না করে, যথা সম্ভব তাকে আগে দেখতে যাওয়া।

৫। রোগীর মাথার পাশে বসে তার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেয়া।

৬। রোগী কিছু চাইলে তাকে তা যথাসাধ্য দেয়ার চেষ্টা করা।

৭। রোগীর জন্য দুয়া করা এবং আলতোভাবে তার শরীরের ফু দেয়া।

অনুশীলনী ২২

১। নিচের উত্তরের সঠিক অংশটি বৃত্ত দ্বারা আবৃত্ত কর।

ক. রোগীকে সর্বদা এমন কথা বলা যা তাকে **আনন্দ দেয় / দুঃখ দেয়**।

খ. রোগী দেখার সময় যথাসম্ভব **বেশি / কম** সময় ব্যয় করা উচিত।

গ. রোগীর সম্মুখে উচ্চবাচ্য করা **উচিত / উচিত নয়**।

ঘ. **সুস্থ / অসুস্থ** ব্যক্তিকে তা দেয়া উচিত, যা সে চেয়েছে।

পাঠ ৪

আযান ও মসজিদের দুয়া

একজন মুসলিম যখন আজান শুনে তখন তাকে দুটি কাজ করতে হয়। প্রথমত, তাকে আজানের প্রতিটি শব্দ মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং যে ভাষায় তার জবাব দিতে নবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন, ঠিক সেই ভাষায় তার জবাব দিতে হবে। অতঃপর আজান শেষ হয়ে গেলে আজান শেষের দুয়া পড়তে হবে। দ্বিতীয়ত, সালাতের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং মসজিদে গিয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করতে হবে। সেই সাথে মসজিদে প্রবেশের সময় এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নবী মুহাম্মদ সা. এর শিখানো দুয়া পড়তে হবে।

আজান ও তার জবাব

আজান শুনে নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে জবাব দিতে হবে

আযানের আরবি শব্দসমূহ	আযানের জবাব	জবাবের বাংলা উচ্চারণ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ	اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ	আল্লাহু আকবার, আল্লা-হু আকবার
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه	أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ	আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্ল-হ
حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ	لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ	লা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ
حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ	لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ	লা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ	اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ	আল্লাহু আকবার, আল্লা-হু আকবার
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ	لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ	লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ

আজান শেষের দুয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآ مَّةِ وَالصَّلٰو ةِ الْقَآئِمَةِ - اٰتِ سِيِّدَنَا مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ) وَابْعَثْهُ مَقَا مًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ (وارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ)

অনুবাদ: *হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই মালিক। তুমি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সা. কে দানকর ওয়াসীলা, সম্মান (ও সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং) তাঁকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করো। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ (এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ নসীব করো। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।)*

মসজিদে প্রবেশের দুয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দাও।"

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দুয়া

اَللّٰهمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكِ

"হে আল্লাহ আমি আপনার দয়া প্রার্থনা করি ।"

আজান ও মসজিদ সংক্রান্ত সুন্নাহ আদাব সমূহ নিম্নরূপ:

আজান

১। আজান হলে কাজ ও খেলাধুলা বন্ধ করে আজানের জবাব দেওয়া।

২। যখন আযান দেয়া হয় তখন কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া।

৩। আজান শেষ হয়ে গেলে আজানের দুয়া মনোযোগ দিয়ে পড়া।

৪। যে আজান দিবে তাকে আযানের আগে অজু করে নেয়া।

৫। আযান দিতে হবে বিশুদ্ধভাবে, উচ্চকণ্ঠে ও মিষ্টি মধুর সুরে।

মসজিদ

১। ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা।

২। মসজিদে প্রবেশের আগে দুয়া পড়া।

৩। দুয়ার আগে নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা।

৪। দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় ও শরীর নিয়ে মসজিদে না যাওয়া।

৫। মসজিদে প্রবেশের আগে যথাযত পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা।

৬। মসজিদের ভিতরে উচ্চবাচ্য ও ঝগড়া না করা।

৭। সোয়াবের মধ্যে পড়ে না এমন কোন কথাবার্তা মসজিদে না বলা।

৮। মসজিদে এমন কোন কাজ বা আচরণ না করা, যা মসজিদের জন্য বেমানান।

৯। মসজিদের ভিতরে কোন ময়লা আবর্জনা না ফেলা, চাই তা যত ছোট ও ক্ষুদ্র হোক।

১০। মসজিদের কোথাও কোন ময়লা আবর্জনা চোখে পড়লে তা উঠিয়ে ফেলা।

১১। মসজিদকে সুগন্ধি দ্বারা সুগন্ধময় করা।

১২। মসজিদের ভিতরে ঢেকুর না তুলা কিংবা বায়ু না ছাড়া।

১৩। কিবলার দিকে পা লম্বা করে না বসা।

১৪। নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচল না করা।

১৫। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দুয়া পড়া।

১৬। বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া।

অনুশীলনী ২৩

১। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর । উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ ক. আজান হলে কাজ ও খেলাধুলায় বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

☐ ☐ খ. আজান শেষ হয়ে গেলে আজানের শেষের দুয়া পড়া উচিত।

☐ ☐ গ. বাম পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়।

☐ ☐ ঘ. মসজিদে প্রবেশের আগে কোন দুয়া নেই।

☐ ☐ ঙ. মসজিদে প্রবেশের আগে নবীর প্রতি দরুদ পেশ করা উচিত।

☐ ☐ চ. দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় ও শরীর নিয়ে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়।

☐ ☐ ছ. মসজিদে প্রবেশের আগে উত্তম পোশাক পরিধান করা আবশ্যক।

☐ ☐ জ. মসজিদের ভিতরে ঝগড়া করাতে কোন অসুবিধা নেই।

☐ ☐ ঝ. সাওয়াবের মধ্যে পড়ে না এমন কোন কথাবার্তা মসজিদে বলা ঠিক নয়।

২। নিচের ঘরে রাখা শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর ।

আবর্জনা	কিবলার	সুগন্ধি	অজু	বাম	উঠিয়ে	মিষ্টি	বায়ু	চলাচল

ক. যে আজান দিবে তাকে আযানের আগে ---- করে নেয়া উচিত।

খ. আযান দিতে হবে বিশুদ্ধভাবে, উচ্চকণ্ঠে ও ------ সুরে।

গ. মসজিদের ভিতরে কোন ময়লা ------- ফেলা ঠিক নয়।

ঘ. মসজিদে কোন আবর্জনা চোখে পড়লে তা ------- ফেলা উচিত।

ঙ. মসজিদকে ------- দ্বারা সুগন্ধময় করা হবে।

চ. মসজিদের ভিতরে ঢেকুর না তুলা কিংবা ----- ছাড়া ঠিক নয়।

ছ. ------ দিকে পা লম্বা করে বসা উচিত নয়।

জ. নামাজরত ব্যক্তির সামন দিয়ে ------- করা যাবে না।

ঝ. --------- পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া প্রয়োজন।

পাঠ ৫
সাওম সংক্রান্ত দুয়া

রমজান মাসকে বলা হয় ‘নেক আমলের বিশেষ মৌসুম’। মুমিন ব্যক্তি এ মাসে ছোটখাটো আমলগুলোও যত্নের সাথে করে। রমজানের রোজার সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয় হলো সেহরি খাওয়া ও ইফতার করা। সেহরি খাওয়ার পর রোজার নিয়ত করা। এই নিয়তের জন্য বিশেষ কোনো শব্দ বা বিশেষ কোন ভাষা উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। আর সেহরির জন্য বিশেষ কোনো দুয়া ও হাদিসে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে খাবার গ্রহণের দুয়া ‘বিসমিল্লাহ’ বলে খাওয়া এবং খাওয়ার শেষের দুয়া পড়ে সেহরি শেষ করা। তবে ইফতারের জন্য হাদিসে কিছু দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। আমরা এখানে দুটি দুয়া উল্লেখ করব।

ইফতারের আগের দোয়া

بِسْمِ الله - اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

‘আল্লাহর নামে (শুরু করছি), হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্যে রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেওয়া রিজিক দ্বারা ইফতার করছি।’

ইফতারের পর বা ইফতার করাকালীন সময় দুয়া

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْأَجْرُ اِنْ شَاءَ اللهُ

‘(ইফতারের মাধ্যমে) পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং যদি আল্লাহ চান সাওয়াবও নিশ্চিত হলো।‘

রোজার ক্ষেত্রে পালনীয় সুন্নাহ আমল সমূহ হল:

১। সেহরির সময় শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে সেহরি খেয়ে নেওয়া।

২। শরীরে শক্তি পাওয়ার জন্য সাধ্যমত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া।

৩। অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা।

৪। সেহরি খাওয়ার পর রোজার নিয়ত করা।

৫। রোজারত অবস্থায় সুন্দর আচরণ ও ব্যবহার দেখানো।

৬। সূর্যাস্ত হয়ে গেলে দেরি না করে ইফতার গ্রহণ করা।

৭। ইফতার গ্রহণের সময় দুয়া পড়া।

৮। যথাসম্ভব খেজুর কিংবা পানি দিয়ে ইফতার শুরু করা।

৯। ইফতারে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ না করা।

১০। যথাসম্ভব মিলেমিশে ইফতার করা এবং অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া।

অনুশীলনী ২৪

১। নিচের ঘরে রাখা শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর ।

সেহরি	ইফতার	অতিরিক্ত	খেজুর	নিয়ত	অগ্রাধিকার	আচরণ

ক. সেহরির সময় শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ------- খেয়ে নেওয়া।

খ. ------- খাওয়া থেকে বিরত থাকা।

গ. সেহরি খাওয়ার পর রোজার ----- করা।

ঘ. রোজারত অবস্থায় সুন্দর ------ ও ব্যবহার দেখানো।

ঙ. সূর্যাস্ত হয়ে গেলে দেরি না করে ------- গ্রহণ করা।

চ. যথাসম্ভব -------- কিংবা পানি দিয়ে ইফতার শুরু করা।

ছ. যথাসম্ভব মিলেমিশে ইফতার করা এবং অন্যকে ------ দেয়া।

পাঠ ৬
নতুন চাঁদ দেখার দুয়া

আল্লাহর অগণিত সৃষ্টির মধ্যে চাঁদ একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো মানুষসহ অনেক সৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। মাস ও দিন গণনার অন্যতম একটি মাধ্যমও চাঁদ। মুসলমানদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও অনুষ্ঠান চাঁদ কেন্দ্রিক। রমজানের রোজা সহ অন্যান্য নফল রোজা, হজের অনুষ্ঠান ও ঈদ পালন চাঁদ দেখে করা হয়। তাই নতুন চাঁদ দেখে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত।

নতুন চাঁদ দেখার দুয়া

اَللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

"আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ।'

আরবি বারো মাসে ১২টি চাঁদ উদিত হয়। নিম্নে আরবি ১২ মাসের নাম দেয়া হলো:

আরবি মাসের নাম বাংলায়	আরবি মাসের নাম আরবিতে
মহররম	مُحَرَّم
সফর	صَفَر
রবিউল আউয়াল	رَبِيْعُ الْأَوَّل
রবিউল সানি	رَبِيْعُ الثَّانِي
জমাদিউল আউয়াল	جَمَادِي الْأَوَّل
জমাদিউল সানি	جَمَادِي الثَّانِي
রজব	رَجَب
শা'বান	شَعْبَانُ
রমজান	رَمَضَان
শাওয়াল	شَوَّال
জিলকদ	ذُوالْقَعْدَة
জিলহজ	ذُوالْحِجَّة

নোট: *শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা ১২ মাসের নাম না দেখে ক্রমানুসারে বলতে পারে।*

পাঠ ৭
গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী অভিব্যক্তি

প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে অনেক কিছু ঘটছে। এসব নিত্যনতুন ঘটনা আমাদের প্রভাবিত করছে। আমাদের জীবনে নিয়ে আসছে সুখ, দুঃখ, আশা ও হতাশা। ফলে আমরা বাধ্য হই আমাদের মনের আবেগ ও আকুতি পেশ করতে। তবে এসব ক্ষেত্রে কিভাবে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে তা ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি নির্দিষ্ট কিছু ইসলামী অভিব্যক্তি। এর মাধ্যমে একদিকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, অপরদিকে আল্লাহর গুনগান করা হয়, যা আল্লাহর ইবাদতের শামিল। তাছাড়া এর মাধ্যমে একটি ইসলামী পরিবেশের তৈরী হয়। এসব অভিব্যক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জন করতে পারি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সহযোগিতা। লাভ করতে পারি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। ইতোপূর্বে তোমরা বেশ কিছু ইসলামী অভিব্যক্তি শিখেছো। এখানে আরো কিছু নতুন ইসলামী অভিব্যক্তি অর্থসহ তুলে ধরা হলো:

১। যে কোনো শুভ সংবাদ শুনে বলবে

الحمدُ للَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)"

২। যে কোন দুঃসংবাদ শুনলে বলবে

الحمدُ للَّهِ علَى كلِّ حالٍ

"সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা"

৩। কারো প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে বলবে

إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ

"আমি আল্লাহর জন্য তোমাকে ভালোবাসি"

৪। কোন বিপদ বা সমস্যায় পতিত হলে বলবে

حَسْبِيَ اللهُ وَنِـــعْمَ الْوَكِيلُ

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক"

৫। মনের ভিতরে কোন মন্দ চিন্তা আগমন ঘটলে বলবে

آمنتُ باللهِ ورسولِه - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম"

কাসাসুল আম্বিয়া
(নবীদের জীবনী)

শিক্ষক ও অভিভাবক:

পৃথিবীতে মানুষের আগমন কোন দুর্ঘটনা কিংবা আকস্মিক বিষয় নয়। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা। আর এজন্য তাদের দেয়া হয়েছে ভালো অথবা মন্দকে বেছে নেয়ার স্বাধীন এখতিয়ার। এখানেই মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে পার্থক্য। ফেরেশতাদের কোন স্বাধীনতা নেই, নেই কোন এখতিয়ার। তাই তাদের কোন পরীক্ষাও নেই। পরীক্ষার জন্য স্বাধীনতা ও এখতিয়ার থাকা আবশ্যক। মানুষ তাকে দেয়া এখতিয়ারের মাধ্যমে মন্দ পরিহার করে ভালো গ্রহণ করবে। এটাই মানুষের কাছে স্রষ্টার দাবি। এর বিপরীত করলে তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলে গণ্য হবে।

দুনিয়াতে ভালো গ্রহণ ও মন্দ পরিহারের জন্য মানুষের একটি নিয়ম নীতি অনুসরণ প্রয়োজন। কিন্তু সেই নিয়ম নীতি তারা পাবে কোথায়? তার সঠিক উত্তর হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের কাছ থেকে তারা সেই নিয়ম নীতি শিখে নেবে। মানব জাতির ইতিহাসে আল্লাহ বিশেষ কিছু মানুষকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যাতে তারা অন্যান্য মানুষের জন্য গ্রহণীয় এবং উত্তম একটি পথ নির্দেশনা দেখাতে পারেন। সেই নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ নবী হলেন নবী মুহাম্মদ সা।

ইসলামে নবুয়তের ধারণা অবতারের ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবতারের ধারণা অনুযায়ী স্রষ্টা নিজেই পৃথিবীতে মানুষের আকৃতি ধারণ করে জন্ম নেন এবং মানুষের জন্য অনুকরণীয় হন।অবতারের ধারণা ইসলামে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। নবুওয়াত সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এ বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে কিছু বিশেষ মানুষকে বাছাই করেন মানুষের জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় হওয়ার জন্য। আর বাছাইকৃত লোকদের প্রতি আল্লাহ তাঁর দিকনির্দেশনা পাঠান। তারা সেই দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন এবং লোকদেরকে তাদের অনুসরণ করতে আহ্বান জানান।

নবীগণ নিছক কোন অনুপ্রাণিত ব্যক্তি নন যারা নিজ অভিজ্ঞতায় লোকদেরকে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করেন। অভিজ্ঞতার আলোকে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগন নির্ভুল হতে পারেন না। তাই তারা কারো জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হওয়ার অযোগ্য। বরং নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন যা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং নির্ভেজাল, যার আলোকে তারা লোকদেরকে সত্য পথ দেখান।

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী নবুয়াত অর্জন করা যায় না বরং তা আল্লাহ প্রদত্ত। কেউ চাইলেই নিজে নবী হতে পারবে না। বরং আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকে নবী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। নবী হওয়ার ব্যাপারে নবীর কোনই হাত নেই, তা সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন।

পাঠ ১
নবী নূহ আ.

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

নবী নূহ আ. কে ও তার দাওয়াতী মিশন কী ছিল

শুরুতে সকল মানুষ ছিল একটি পরিবার ভুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ

নবীর শিক্ষা পরিহার লোকদের অনৈক্যের পথে ধাবিত করে

যারা আদম আ. এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে

কারো ভক্ত হয়ে তার ছবি তৈরি করা প্রতিমাপূজার প্রথম পদক্ষেপ

মানবজাতির প্রতি নবী প্রেরণ বান্দার প্রতি আল্লাহর করুণার অন্যতম প্রকাশ

আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেন যারা নবীদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে

আল্লাহ মুমিনদেরকে বিস্ময়কর উপায়ে বিপদ থেকে হেফাজত করেন

আদম আ. এর সন্তানরা ছিলেন আল্লাহর প্রিয়পাত্র। প্রথম দিকে তারা ছিলেন একটি বড় সুখী পরিবার। আল্লাহর রহমতে দ্রুত তাদের বংশ বৃদ্ধি পেলো। তারা সকলে এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। তা দেখে শয়তানের হিংসা হলো। সে আদম সন্তানদের অনিষ্ট চাইল। শয়তান এক দুষ্ট ফন্দি আঁটলো।

আদম সন্তানের মধ্যে অনেকে ছিলেন খুবই ধার্মিক। তারা ছিলেন সকলের সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র। তারা মারা গেলে অনেকে তাদের অভাব অনুভব করলো। শয়তান এর সুযোগ নিল। সে চাইলো লোকদের দিয়ে শিরক করাতে। শয়তান জানে, আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না।

শয়তান লোকদের বললো মৃত ধার্মিক লোকদের ছবি ও মূর্তি তৈরী করতে। তারপর মূর্তিগুলির পূজা করার জন্য তাদের প্রতারিত করলো। বোকা লোকেরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেল। তারা আল্লাহর সাথে শিরক করতে লাগলো।

আল্লাহ তাদের সঠিক পথে ফিরাতে চাইলেন। তিনি একজন নবী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন । আল্লাহ নূহকে নবী হিসেবে মনোনীত করলেন। নবী নূহ আ. লোকদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে বললেন। বললেন, মূর্তি পূজা ছেড়ে দিতে। কিন্তু লোকেরা তার কথা শুনতে চায়নি। তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তাকে পাগল বলে ডাকে। নবী নূহ আ. ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি দাওয়াত দিলেন সাড়ে নয় শত বছর। হাতে গোনা কিছু লোক তার দাওয়াত গ্রহণ করলো। বাকি লোকেরা তাকে অস্বীকার করলো। তার নিজের ছেলেও তাকে অস্বীকার করলো।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহ নবী নূহ আ. কে একটি জাহাজ তৈরির নির্দেশ দিলেন। তাতে প্রত্যেক প্রকার প্রাণীর এক জোড়া উঠাতে বললেন। হযরত নূহ আ. ও সকল মুমিন জাহাজে আরোহণ করলেন।

অবশেষে আল্লাহ পাঠালেন মহা প্লাবন। সেই সাথে পাঠালেন প্রবল ঝড় ও তুফান। ঝড় ও প্লাবনে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলো। অবিশ্বাসীরা পানিতে ডুবে গেল। এমনকি নূহ আ. এর অবিশ্বাসী সন্তান কিনানও ডুবে গেল।

চল্লিশ দিন পর আল্লাহর নির্দেশে ঝড় ও প্লাবন উধাও হলো। নবী নূহ আ. ও মুমিনগণ অত্যধিক আনন্দিত হলেন। তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও তার প্রশংসা করলেন। তারা নতুন করে দুনিয়ার বুকে বসতি স্থাপন করলেন। নতুন করে পৃথিবীতে এক আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হলো। সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে তারা ছড়িয়ে পড়লেন পৃথিবীর সর্বত্র।

অনুশীলনী ২৫

১। নিচের ঘরে রক্ষিত শব্দ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

সুখী	হিংসা	নবী	মূর্তি	ইবাদত	প্লাবন	শিরকের	অবিশ্বাসীরা	অস্বীকার	মুমিনগণ

ক. আদম আ. এর সন্তানরা প্রথম দিকে ছিলেন একটি বড় ------- পরিবার।

খ. তারা সকলে এক আল্লাহর ইবাদত করতেন, যা দেখে শয়তানের -------- হলো।

গ. শায়তান বললো, তোমরা তোমাদের মৃত ধার্মিক লোকদের ছবি ও ---- তৈরী ভালো ভালো হবে।

ঘ. এভাবে শয়তান মানুষদের দিয়ে মূর্তি তৈরী করলো ও তাদের -------- পথে ধাবিত করলো।

ঙ. তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ নূহ আ. কে --------- করে পাঠালেন।

চ. নবী নূহ আ. লোকদের এক আল্লাহর ---------- করতে ও মূর্তি পূজা ছেড়ে দিতে বললেন ।

ছ. হাতে গোনা কিছু লোক তার দাওয়াত গ্রহণ করলো ও বাকি লোকেরা তাকে ------- করলো।

জ. শেষ পর্যন্ত আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠালেন মহা ----------- ও ঝড়-তুফান।

ঝ. ঝড় ও প্লাবনে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলো ও ------------- পানিতে ডুবে গেল।

ঞ. চল্লিশ দিন পর ঝড় ও প্লাবন উধাও হলে ---------- আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

নবী নূহ আ. ও তার দাওয়াতি মিশন
পর্ব ১: আদম সন্তানদের সুখ ও শয়তানের হিংসা

নবী আদম আ. ও তার সন্তানরা ছিলেন আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত। আল্লাহ তাদের জীবন ও সম্পদে দিয়েছিলেন বরকত। ফলে দ্রুত তাদের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অল্প কয়েক বছরেই তারা ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বময়। তাদের হাতে গড়ে উঠলো অনেক গ্রাম, শহর, নগর ও বন্দর। তারা জমি আবাদ ও ফসল উৎপাদন করে জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে এলো। আদম সন্তানরা এভাবে সুখী ও আনন্দময় জীবন কাটাতে লাগলো। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত পেয়ে তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হলো। তারা সকলেই ছিল একটি বড় পরিবারের অংশ। তারা তাদের পূর্বপুরুষ নবী আদম আ. এর শিক্ষাকে অনুসরণ করে এক আল্লাহর বন্দেগী করতো। সকলে মিলেমিশে কাজ করতো ও সত্যের প্রচার করতো।

শয়তান ছিল আদম ও তার সন্তানদের চির শত্রু। সে সর্বদাই মানুষের অনিষ্ট চায়। শয়তান এবার অতীতের চেয়ে অনেক বেশি হিংসায় জ্বলে উঠলো। শয়তান দেখল, সে নিজে এবং তার সন্তানরা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে, অভিশপ্ত। তারা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত। আর তাদের চোখের সামনেই আদমের সন্তানরা আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়ে সুখী জীবন যাপন করে চলছে। শয়তান এটাও জানে যে, তাকে একদিন তার সন্তান ও দলবলসহ জাহান্নামে যেতে হবে। কিন্তু আল্লাহর অনুসারী আদম ও তার সন্তানরা আবারও ফিরে যাবে চির সুখের জান্নাতে। "না তা মেনে নেয়া যায় না" শয়তান মনে মনে বললো। "আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার সাথে জ্বলন্ত আগুনের জাহান্নামে নিয়ে যাব।" শয়তান নতুন করে শপথ নিল। কিন্তু কিভাবে তা সে করবে?

শয়তান ভালো করেই জানে, আল্লাহর তার বান্দাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেন একটি গুনাহ ছাড়া। আল্লাহ কখনো শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আল্লাহর উপাসনার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করে, তাকে আল্লাহ কখনো মাফ করেন না। যে শিরক করে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। জ্বলতে হবে দুযোখের আগুনে অনন্তকাল। আর কেনই বা আল্লাহ শিরকের মত গুনাহকে ক্ষমা করবেন? আল্লাহ হলেন মানুষ সহ সবকিছুর স্রষ্টা। একমাত্র তিনিই প্রতিনিয়ত মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণ করছেন ও তাদের সুখ-শান্তি দিচ্ছেন। তাহলে মানুষ কেন তার চেয়ে অন্য কাউকে বেশি ভালবাসবে? অন্য কাউকে তার সমান মনে করবে? অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করবে ? কেন মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে?

এমতাবস্থায় শয়তান কিভাবে মানুষদের শিরকের মধ্যে ফেলতে পারে? কিন্তু শয়তানের আছে দুষ্ট বুদ্ধি। সে মনে মনে স্থির করলো, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমেই আদম সন্তানদের দিয়ে শিরক করাতে হবে। এভাবেই তারা জাহান্নামে যাবে। শয়তান তার ষড়যন্ত্রের জাল বোনতে সুযোগের অপেক্ষায় রইলো।

পর্ব ২: অতি ভক্তি থেকে শিরক

আদম সন্তানদের মধ্যে কিছু পুরুষ ও নারী ছিলেন খুবই আল্লাহওয়ালা। তারা আল্লাহকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং দিনরাত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতেন। তারা মারা গেলে সাধারণ লোকেরা অত্যন্ত দুঃখ পেল। কারণ তারা লোকদের ভালো পথ দেখাতেন। তারা ছিলেন সমাজের আলোক বর্তিকা ও ভালো উদাহরণ। অনেকেই তাদের কথা নিরবে স্মরণ করতো। আর এ স্মরণ তাদের আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দিত।

শয়তান এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। সে লোকদের বন্ধু সেজে তাদের কাছে আসলো। বলল, *"কেন তোমরা তোমাদের ঐসব দ্বীনদার পূর্বপুরুষদের ছবি তৈরি করছ না? এদের ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে তাদেরকে বেশি স্মরণ করতে পারবে। তাদের থেকে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা পাবে। তাদের প্রতি তোমাদের কি সম্মান দেখানো উচিত নয়?"*

লোকেরা তাতে সম্মতি জানালো এবং অনেকেই তাদের ছবি অংকন করে দেয়ালে ঝুলালো। ছবি দেখে তাদের প্রতি তারা ভালবাসা নিবেদন করতো।

এবার শয়তান তাদের কাছে এলো নতুন ফন্দি নিয়ে। শয়তান বলল, মহান ব্যক্তিদের ছবি ঝুলিয়ে রাখার চাইতে তাদের মূর্তি তৈরি করা অনেক ভালো। তাদেরকে বেশি স্মরণের জন্য মূর্তি বেশি উপযোগী। এবারও লোকেরা শয়তানের ফাঁদে পা দিল। তারা নতুন উদ্যমে তাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষদের মূর্তি তৈরি করে নিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত তারা এক আল্লাহর বন্দেগী করছিল। অবশ্য এ সকল সম্মানিত লোকদের মূর্তি তাদের কাছে ছিল মহামূল্যবান।

এভাবে বছরের পর বছর চললো। একটি প্রজন্মের পর নতুন আরেকটি প্রজন্ম আসলো। নতুন প্রজন্মের লোকেরা দ্বীনের অনেক শিক্ষা ভুলে যেতে থাকলো। অবশেষে শয়তান তাদেরকে দিয়ে তাদের হাতে গড়া মূর্তির উপাসনা করাতে সক্ষম হল। লোকেরা এখন আল্লাহর পাশাপাশি ঐ সমস্ত মূর্তির উপাসনা করতে লাগল। তারা বিচ্যুত হলো সত্য পথ থেকে। তারা সরে পড়লো এক আল্লাহর বন্দেগী থেকে। তারা তাদের পূর্বপুরুষ নবী আদম আ. এর শিক্ষাকে একেবারেই ভুলে গেল। নতুন প্রজন্ম এভাবেই ইসলাম থেকে সরে গিয়ে মুশরিক হয়ে গেল। সেই সুবাদে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়লো সব ধরনের নোংরামি, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো। লিপ্ত হল ঝগড়াঝাঁটি, চুরি-ডাকাতি ও খুন-খারাবিতে। এখন তারা পূর্ণমাত্রায় শয়তানের অনুসারী। তারা এখন জাহান্নামের পথের যাত্রী।

পর্ব ৩: সঠিক পথের দিশা ও নবী নূহ আ.

আল্লাহ তাদের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। কিন্তু সেই সাথে আল্লাহ হলেন অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। তাই আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের মাঝে নবী পাঠাবেন। যে নবী তাদেরকে আবার নিয়ে আসবেন জান্নাতের পথে। তিনি হবেন এমন নবী, যিনি লোকদের সঠিক ও সত্য পথ

দেখাবেন। লোকদের সামনে তুলে ধরবেন তাদের পিতা নবী আদম আ. এর শিক্ষা।

আল্লাহ নুহকে নবী মনোনীত করলেন, যিনি লোকদের সঠিক পথ দেখাবেন এবং ধৈর্য্যের সাথে তাদের ইসলাম শিক্ষা দেবেন। নূহ আ. ছিলেন খুবই ভালো মানুষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, সত্যবাদী এবং সমাজ সচেতন। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি লোকদেরকে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান করতে লাগলেন। তিনি বললেন, *"হে লোক সকল! তোমরা মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও এবং এক আল্লাহর বন্দেগী করো আর শয়তানের অনুসরণ করো না।"*

কিন্তু লোকেরা নূহ আ. এর কথার কোনই গুরুত্ব দিলো না। বরং তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলো। তারা তাকে একজন পাগল বলে কটাক্ষ করল। কিছু দুষ্ট লোক তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করলো এবং তাকে হত্যার হুমকি দিল। খুব কম সংখ্যক লোক তার আহ্বানে সাড়া দিল ও তাকে নবী মেনে নিল। অল্প সংখ্যক লোক ফিরে আসলো ইসলামের পথে, এক আল্লাহর বন্দেগির পথে।

যারা তাকে অস্বীকার করেছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল তার আপন ছেলে। তার নাম ছিল কেনান। সে ছিল অভদ্র, উগ্র এবং জেদী। এমনকি যখন নুহ আ. অন্য লোকদের সাথে আলাপ করতেন তখন কেনান সেখানে গিয়ে বলতো, "*তোমরা তার কথা শুনবে না*"। কেনান ছিল বোকা ও দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে, যদিও তার জন্ম হয়েছিল একজন মহান নবীর ঘরে। নবী নূহ আ. একাধারে সাড়ে নয়শত বছর তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু লোকেরা তাকে বিশ্বাস করল না ও মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতেও সম্মত হলো না। তারা এক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে আসতে অসম্মতি জানালো। আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন, এমন লোকদের শাস্তি দেবেন, যারা ক্রমাগতভাবে নবী নূহ আ. কে অস্বীকার করছে, যারা সত্য পথে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন, সকল অবিশ্বাসীকে বড় ধরনের শাস্তি দিতে ও বন্যার পানিতে ডুবিয়ে মারতে।

পর্ব ৪: জাহাজ নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি

আল্লাহ নবী নুহ আ. কে নির্দেশ দিলেন একটি বড় জাহাজ নির্মাণ করতে। এটা এত বড় ও অভিনব জাহাজ হবে, যা ইতোপূর্বে কেউ নির্মাণ করেনি বা দেখেনি।

আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, তিনি অচিরেই বিশাল প্লাবন ও বন্যা দিবেন, যা ইতোপূর্বে দুনিয়াবাসী দেখেনি। যে বন্যা সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করবে। এ বন্যায় সকল দুষ্ট লোককে তিনি ডুবিয়ে মারবেন। বেঁচে থাকবে কেবল ঈমানদারগণ।

আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নবী নুহ আ. জাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। তার সাথে থাকা অল্প সংখ্যক ঈমানদার লোকেরা তাকে এই কাজে সহযোগিতা করছিল। নবী নূহ আ. এর জাহাজ নির্মাণ দেখে অবিশ্বাসী লোকেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করল। তারা একে অন্যকে

মশকরা করে বলছিল, *"দেখো দেখো লোকটা কত নির্বোধ! এমন এক স্থানে সে জাহাজ নির্মাণ করছে যার আশেপাশে না আছে কোন সাগর, নদী কিংবা জলাশয়।"*

"জনাব, কখন এবং কোথায় আপনি এই জাহাজ ভাসাবেন?" কেউ কেউ তাকে ঠাট্টা চলে জিজ্ঞেস করছিল। অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, *"আমরা কি আগেই বলিনি যে, এই লোকটা একটা পাগল"*

নূহ আ. লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন 'ভাইসব আমার পক্ষ থেকে এটাকে সতর্ক বাণী হিসেবে গ্রহণ করো। আমি মিথ্যা বলি নাই। আল্লাহ অচিরেই একটি প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং প্লাবন প্রেরণ করবেন যা সবকিছুকে ধ্বংস করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। লোকেরা তার কথা হাসির ছলে উড়িয়ে দিয়ে বলল, *"সত্যিই বৃষ্টির ঝড়"* অন্য আরেকজন বলল, *"আমরা তো এখানে বৃষ্টির কোন ক্ষুদ্রতম আলামতও দেখতে পাচ্ছি না।"*

নবী নূহ আ. তার পুত্র কেনানকে সর্বশেষ উপদেশ দিলেন। বললেন, *'প্রিয় পুত্র! এখনো সময় আছে, আল্লাহর আনুগত্য কর ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল। আমাকে সাহায্য করো, তোমাকে মহা বিপদ থেকে রক্ষা করতে, যে বিপদ সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে'*। নবী নূহ আ. আরো বললেন, *'হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহকে বিশ্বাস করো এবং আমার সাথে জাহাজে আরোহন কর আর অবিশ্বাসীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করো'*। 'আমার পিতা নূহ সত্যিই একজন পাগল' কেনান লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসির চলে বলল। তারা সকলে এক বাক্যে বলল, *'নূহকে তার বার্ধক্য বোকা বানিয়ে দিয়েছে'*।

নূহ আ. এবং তার অনুসারীরা দিনরাত জাহাজ নির্মাণের কাজ করে যাচ্ছিলেন। দীর্ঘদিনের ক্রমাগত প্রচেষ্টার পর একটি বিশাল জাহাজ তৈরি হল। আল্লাহ তখন নবী নূহ আ. কে প্রত্যেক প্রাণী থেকে একজোড়া করে পশুপাখি জাহাজে উঠাতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ প্রয়োজনীয় গাছের চারা, ফল ও তার বীজ সংগ্রহ করতে বললেন। সেই সাথে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ফল ফলাদি মওজুদ করে জাহাজে উঠাতে বললেন। নির্দেশ মোতাবেক নবী নূহ আ. সম্ভাব্য সব কিছুর প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং তা জাহাজে উঠালেন। তিনি ভাল করেই জানতেন তাকে পৃথিবীতে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে।

পর্ব ৫: বিশাল প্লাবন ও পাপমুক্ত পৃথিবী

সকল প্রস্তুতি শেষ করে নবী নূহ আ. ও তার সঙ্গীরা নিজেদের খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী জাহাজে উঠলেন। পশু পাখি ও তাদের খাদ্য উঠলেন জাহাজের অন্য তলায়। নূহ আ. ও তার অনুসারীরা জাহাজের বিভিন্ন দরজা দিয়ে জাহাজে আরোহণ করলেন আর তারা ভিতর থেকে বাহিরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

অন্যদিকে অবিশ্বাসীরা তাদের পিছনেই রয়ে গেল। তারা দূরে থেকে ঈমানদারদের নিয়ে

হাসাহাসি করছিল। তারা হাসছে এই ভেবে যে, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, যেখানে সামান্যতম শীতল বাতাস নেই, সেখানে কিছু লোক জাহাজের উপর বসে আছে এবং বলছে যে,অচিরেই প্রচন্ড ঝঞ্ঝা চলে আসবে।

অবিশ্বাসীদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমান করে, হঠাৎ সূর্য হারিয়ে গেল। ঘন কালো অন্ধকার নেমে এলো। এতই অন্ধকার যে, দিনকে মনে হচ্ছে রাতের মত। সেই সাথে আকাশে প্রচন্ড মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকালো । শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি ও প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া। অন্যদিকে মাটি ফেটে বিভিন্ন স্থান থেকে পানি উঠতে লাগলো। এমনকি রান্নার চুলো থেকেও পানি বের হতে লাগলো। পানির তীব্র স্রোতে সবকিছু ভেসে যাচ্ছে। প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবন সবকিছুকে তছনছ করে দিল। বাড়িঘর ও গাছপালা সবকিছু ডুবে গেছে। মানুষ ও পশুপাখি সবকিছু পানিতে ভাসছে। ঈমানদারগণ জাহাজে থেকে সব দৃশ্য দেখছিলেন। তারা মনে মনে আল্লাহ কে স্মরণ করছিলেন ও তার কাছে ইস্তেগফার করছিলেন।

নবী নূহ আ. হঠাৎ দেখলেন তারা ছেলে কিনান অবিশ্বাসীদের মাঝে পানিতে সাতরাচ্ছে। তিনি তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করলেন। তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, *"প্রিয় পুত্র! আমাকে বিশ্বাস করো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসো। অচিরেই সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাকে বিশ্বাস করো এবং ঈমান গ্রহণ করে জাহাজে আরোহন করো।"*

কিন্তু কেনান আগের মতোই তাকে অস্বীকার করল এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেল। *"যখন বন্যা সবকিছু ডুবিয়ে দিবে, তখন তুমি কি করবে"?* নবী নূহ আ.তাকে প্রশ্ন করলেন। *"আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাব। আমার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না"* কেনান অজ্ঞের মতো উত্তর দিল। *"এটা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না"* নবী নূহ আ. স্পষ্টভাবে বললেন।

"তাহলে আমি পাহাড়ের চূড়ার সবচেয়ে লম্বা গাছটির ডালে উঠে নিজেকে রক্ষা করব।" কেনান জবাব দিল। *"তুমি কোন ভাবেই আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না"* নবী নুহ আ. বললেন। তার দুষ্ট প্রকৃতির সন্তানকে আর কিছু বলার ছিল না। তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অল্প কিছুক্ষন পরেই বিশাল এক ঢেউ এসে কেনান ও তার সঙ্গীদের ডুবিয়ে দিল।

অবশেষে সবকিছু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। নূহ আ. এর জাহাজ নিরাপদে পানিতে ভাসছে। চতুর্দিকে পাহাড় সম ঢেউ একটির উপর আরেকটি আঁচড়ে পড়ছে। ধ্বংস হয়ে গেল সব কিছু। কেবল নিরাপদ রইল সেই জাহাজ ও জাহাজে অবস্থিত লোকজন ।

সবকিছু ডুবে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে বৃষ্টি থামতে থাকলো। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় কোথাও কোন ভূমি চোখে পড়ছে না। সর্বত্রই যেন পানি। এভাবে অনেকদিন জাহাজ পানিতে ভাসলো। আকাশের মেঘমালা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকলো এবং আকাশের কিছু অংশ এখন দেখা

যাচ্ছে। পানি কমতে শুরু করলো। কোথাও কোথাও পাহাড়ের চূড়া এখন ভেসে উঠছে। প্রতিদিন পানি কমছে। জাহাজ ভিড়ল জুদি পাহাড়ের পাদদেশে।

অবশেষে একটি রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে নবী নূহ আ. এবং তার বিশ্বাসী অনুসারীরা জাহাজ থেকে স্থলভাগে নেমে এলেন। এ ছিল তাদের জন্য এক মহা আনন্দের দিন। পৃথিবী এখন অবিশ্বাসী মুক্ত। এখানে বিশ্বাসীদের কোন শত্রু নেই। যারা বেঁচে আছেন, তারা সংখ্যায় কম হলেও তারা ছিলেন পরস্পর ভাই ভাই। ঈমানের বন্ধনে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের মাঝে নেই কোন হিংসা-বিদ্বেষ। সকলেই এক আল্লার উপর বিশ্বাসী। সকলেই এক আল্লাহর বন্দেগী করেন।

নূহ আ. এর অনুসারীরা আবার পৃথিবীতে নতুন করে বসবাস শুরু করলেন। দিনের পর মাস, মাসের পর বছর যেতে থাকলো। তাদের সন্তান-সন্ততি হলো আর হলো নাতি নাতনি। জনসংখ্যা আবারও দ্রুত বাড়তে থাকলো। নুহ আ. এর অনুসারীরা আবারো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেন।

তারা নতুন করে গ্রাম, গঞ্জ ও শহর গড়লেন। মানব সভ্যতাকে নতুন করে সাজিয়ে তুললেন। মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু নতুনভাবে উদ্ভাবন ও তৈরি করতে লাগলেন। তারা ছিলেন নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান লোক। যারা ছিলেন এক আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং নবীদের অনুসারী। *“শান্তি বর্ষিত হোক নূহ আ. এবং তার অনুসারীদের প্রতি”*

এ গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্ন লিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকেই জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পরিপক্ক ছিল। এমন নয় যে তারা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে বানর থেকে মানুষ হয়েছে।*
- *মানুষ জন্মগতভাবে মুসলিম এবং এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়*
- *মূলত সকল মানব ছিল এক পরিবার ভুক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ। অবিশ্বাসই তাদের মধ্যে অনৈক্যের জন্ম দিয়েছে*
- *দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুগুলো উপভোগ করা হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া হবে*
- *যারাই আদম আ. এর পদর্শিত পন্থা অবলম্বন করবে তারাই জান্নাতে যাবে*
- *আর যারা অনুসরণ করবে শয়তানের পদাঙ্ক তাদের পরিণাম হবে জাহান্নাম*
- *যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে আল্লাহ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করেন না*
- *আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইবাদত, প্রার্থনা কিংবা আল্লাহর গুণাবলিতে শরিক করার নাম হচ্ছে শিরিক*
- *আল্লার ইবাদত ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসা দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিস*
- *কারো প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার দাবি হলো তার সাথে কাউকে অংশীদার না করা*
- *পরহেজগার লোকদের জন্য আমরা আমাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং দুঃখ প্রকাশ করব*
- *শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ব্যক্তিদের ছবি অংকন মূর্তি পূজার প্রথম পদক্ষেপ*
- *কারো সম্মানে মূর্তি তৈরি করা লোকদের দ্রুত মূর্তি পূজার দিকে নিয়ে যায়*
- *অন্য কারো প্রতি আল্লাহর সমান ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন ইসলামে হারাম*
- *সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসা তার রাগ এবং শাস্তির চেয়ে অনেক ব্যাপক*
- *মানুষদের সঠিক পথে দেখাতে আল্লাহ সকল যুগে নবী এবং রাসূল প্রেরণ করেন*

* *সকল নবী ও রাসূল প্রথম নবী আদম আ. এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন*
* *নবীগণ জন্মগতভাবে অত্যন্ত সত্যবাদী, সৎ এবং দায়িত্ব সচেতন*
* *অবিশ্বাসীরা সব সময়ই নবীদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে*
* *সকল যুগেই কম সংখ্যক লোক নবীদের দাওয়াত গ্রহণ করে থাকে*
* *একজন নবীর ঔরসেও দুষ্ট সন্তান জন্ম নিতে পারে আবার একজন দুষ্ট লোকের ঔরসেও জন্ম নিতে পারে একজন নবী (যেমন নবী ইব্রাহিম আ)*
* *আল্লাহ কেবল তাদেরকে সত্য পথ দেখান যারা তা চায়। কোন নবী চাইলেও কাউকে সত্য পথে নিয়ে আসতে পারেন না*
* *নবীরা মানুষের কাছে তাই পেশ করেন, যা তারা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন*
* *সকল নবীই ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল ও দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সচেতন*
* *আল্লাহ কেবল তাদেরকেই শাস্তি প্রদান করেন, যারা অহংকারবশত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে*
* *আল্লাহ কোন জাতির কাছে নবী প্রেরণ না করে তাদেরকে শাস্তি দেন না*
* *কেবল ঈমানদার ব্যক্তিরাই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়*
* *আল্লাহ বিস্ময়কর পদ্ধতিতে ঈমানদারদের রক্ষা করে থাকেন*
* *নবীরা আল্লাহর নির্দেশনায় যে কাজগুলো করে থাকেন তা অনেক সময় অবিশ্বাসীদের কাছে হাস্যকর মনে হয়*
* *ঈমানদাররা সর্বদা নবীদের সাথে সহযোগিতা করে, যদিও নবীদের অনেক কাজ তাদের কাছে পরিপূর্ণভাবে বোধগম্য হয় না*
* *নবীরা যা বলেন তা অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হয়*
* *আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি কিংবা মৃত্যু আসে*
* *সকল অবিশ্বাসীই মনে করে তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে*
* *কেউ অন্তর থেকে কিছু বিশ্বাস না করলে, তাহলে তাকে জোর করে বিশ্বাস করানো যায় না*
* *যিনি দাওয়াতি কাজ করবেন, তার দায়িত্ব কেবল মানুষের কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেয়া*
* *আল্লার শাস্তি থেকে কেবল তারাই রক্ষা পায় যারা নবীদের শিক্ষা কে গ্রহণ করে ও তাদের অনুসরণ করে*
* *ঈমানদাররা আল্লাহর প্রশংসা এবং তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমেই আনন্দ উদযাপন করে*
* *যারাই আল্লাহ এবং তার নবীদের প্রতি বিশ্বাস আনে তারাই দুনিয়াতে কর্তৃত্বের মালিক হয়*
* *যারা আল্লাহ এবং তার নবীদের প্রতি বিশ্বাস রাখে তারাই ওয়ারিস হবে জান্নাতের যা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার*

অনুশীলনী ২৬

১। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর । যথাযত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ ক. আদম আ. এর সন্তানরা একসময় সবাই মুসলিম ছিল।

☐ ☐ খ. আল্লাহ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করেন, না যারা আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত করে।

☐ ☐ গ. দ্বীনদার ও পরহেজগার লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলিমের জন্য উচিত নয়।

☐ ☐ ঘ. যে কোনো ধরনের মূর্তি ও প্রতিমা তৈরি করা ইসলামে হারাম।

☐ ☐ ঙ. কেনান ছিল নবী নূহ আ. এর সন্তান, যে ছিল অবিশ্বাসী।

☐ ☐ চ. নবী নুহ আ. তার কওমের কাছে দাওয়াত দিয়েছিলেন ৯৫০ বৎসর।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ ছ. যারা নবীদেরকে অস্বীকার করে, আল্লাহ সাথে সাথেই তাদের শাস্তি দেন।

☐ ☐ জ. একজন নবী যা বলেন তা সবই সঠিক ও সত্য।

☐ ☐ ঝ. আল্লাহ ঈমানদারদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন না।

☐ ☐ ঞ. সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হলো ঈমানদার ব্যক্তিগণ।

☐ ☐ ট. আল্লাহ মৃত্যুর পরেও লোকদের তওবা কবুল করেন।

☐ ☐ ঠ. যারা আল্লাহ এবং তার নবীদের অনুসরণ করে কেবল তারাই রক্ষা পায়।

২। নিচের প্রতিটি ঘরে চারটি করে শব্দ আছে। এগুলোর তিনটি একটি সাথে আরেকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু একটি শব্দ সামঞ্জস্যহীন। সামঞ্জস্যহীন শব্দটি বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত কর।

হিংসুক	আদম	শয়তান	অহংকারী
মূর্তি	আল্লাহ	এক	সৃষ্টিকর্তা
বিশ্বাস	ভালোবাসা	শিরক	ইবাদত
নবী	ছবি	মূর্তি	প্রতিমা
নূহ	ভালো	সত্যবাদী	পাগল
অবিশ্বাসীগন	অবাধ্য	পাপী	ধার্মিক
কেনান	বিশ্বাসী	বোকা	নবীপুত্র
হাওয়া	জাহাজ	পশুপাখি	বন্যা
ঠাট্টা	হাসাহাসি	বিশ্বাসীগণ	আঘাত
শাস্তি	ডুবিয়ে	ধ্বংস	বিশ্বাসী
শয়তান	জোড়া	পশু	পাখি
আনন্দিত	বিপদমুক্ত	কৃতজ্ঞতা	অবিশ্বাসী

৩। তোমার পিতা-মাতা কিংবা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে নির্ধারিত স্থানে কোরানের আয়াত দুটির অনুবাদ লিখো।

----------------- (সূরা নং ১১, সূরা হুদ, আয়াত নং ২৫ ও ২৬)

----------------- (সূরা নং ১১, সূরা হুদ, আয়াত নং ৩৭)

পাঠ ২
নবী ইব্রাহিম আ. ও নবী ইসমাইল আ.

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

নবী ইব্রাহিম আ. এর জীবন ও তার দাওয়াতি কার্যক্রম

অনেক শিশু কখনো কখনো জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বড়দের চেয়েও অগ্রগামী হয়

কখনো সম্পদের লোভ, সম্মান কিংবা জালিমের ভয় লোকদের ইসলাম থেকে দূরে রাখে

আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন, যারা তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখে এবং সত্যের উপর অবিচল থাকে

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা মানে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু, প্রয়োজনে রক্ত মাংস আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা

আল্লাহর অনুমতি ব্যতিত এমনকি কোন ছুরিও কাটতে এবং আগুনও পুড়াতে পারে না

আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তিদের আবেদন গ্রহণ করেন এবং তাদের জীবনে বরকত দান করেন

পাঁচ হাজার বছর আগে ইরাকে আজর নামে এক ব্যক্তি ছিল। আজব পাথর ও কাঠ খোদাই করে নিজ হাতে মূর্তি বানাত। লোকেরা আজরের তৈরি মূর্তির উপাসনা করত। আজর ছিল সকলের কাছে পরিচিত এক সম্মানিত ব্যক্তি। আজরের ছিল এক পুত্র সন্তান, যার নাম ছিল ইব্রাহিম।

বালক ইব্রাহিম ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও খুব সাহসী। সকলেই ইব্রাহিমকে আদর ও সম্মান করতো। কিন্তু ইব্রাহিম মূর্তি পূজা পছন্দ করতেন না। তিনি জানতেন, মূর্তি কোন কিছু শুনতে, দেখতে ও বলতে পারে না। ইব্রাহিম জানতেন, মূর্তি না পারে সাহায্য করতে, না ক্ষতি করতে।

ইব্রাহিম লোকদের মূর্তি পূজা পরিহার করতে বললেন। তিনি তাদের বললেন সব কিছুর স্রষ্টা এক আল্লাহর ইবাদত করতে। তার কথায় লোকেরা রাগান্বিত হলো এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করল।

বছরের বড় উৎসবের দিন সব লোক শহরের বাহিরে চলে গেল। ইব্রাহিম তাদের সাথে না গিয়ে একা শহরে অবস্থান করলেন। ইব্রাহিম চুপিসারে উপাসনালয়ে ঢুকলেন, যেখানে মূর্তিগুলো রাখা ছিল। তারপর এক এক করে কুড়াল নিয়ে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। কেবল বড় মূর্তিটিকে রেখে দিলেন আর তার কাঁধে কুড়াল ঝুলিয়ে রাখলেন। অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে মূর্তিগুলোর এ দশা দেখে লোকেরা অবাক হলো।

তারা ইব্রাহিমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই কাজ কে করেছে? ইব্রাহিম আ. বললেন, যে মূর্তিটির কাঁধে কুড়াল ঝুলে আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো? লোকেরা বলল, মূর্তি তো কোন কিছুই করতে পারেনা, তাকে জিজ্ঞেস করে কি লাভ? ইব্রাহিম আ. বললেন, আমি কি বলি নাই, মূর্তিগুলো কোন কিছুই করতে পারেনা। লোকদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ কান্ডটি ইব্রাহিম ঘটিয়েছে। তারা ইব্রাহিম আ. এর উপর রেগে গিয়ে তাকে মারার জন্য বিশাল আগুনে ফেলে দিল। আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহিম আ. এর জন্য আগুন ঠান্ডা ও শান্তিময় হয়ে গেল।

সে সময়কার বাদশার নাম ছিল নমরুদ এবং সেও ছিল মূর্তিপূজক। ইব্রাহিম আ. তাকে এক আল্লাহর দাওয়াত দিলে সে তা অস্বীকার করলো। নমরুদ ইব্রাহিম আ. এর উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করলো।

ইব্রাহিম আ. বহু বৎসর দেশে দেশে ঘুরে লোকদেরকে এক আল্লাহর দাওয়াত দিলেন।আল্লাহ তখন ইব্রাহিম আ. কে নির্দেশ দিলেন মক্কা নামক স্থানে ভ্রমণ করতে। ইব্রাহিম আ. তার ধার্মিক স্ত্রী হাজেরা এবং শিশু ইসমাইলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বহু পথ পাড়ি দিয়ে তারা মরুভূমির মধ্যস্থিত মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। পানিহীন মরুময় মক্কায় তখন গাছপালা পশুপাখি ও মানুষের অস্তিত্ব ছিলোনা। আল্লাহ নির্দেশে ইব্রাহিম আ. তার স্ত্রী ও শিশু পুত্র ইসমাইলকে মক্কায় রেখে এলেন। সঙ্গে থাকা খাদ্য ও পানি ফুরিয়ে গেলে মা এবং শিশু সেখানে পানির সংকটে পড়লেন। আল্লাহ নিজ কুদরতে সেখানে জমজম কূপ খুলে দিলেন। পানির সন্ধান পেয়ে সেখানে বহু লোকের বসতি স্থাপিত হলো। কয়েক বৎসর পর নবী ইব্রাহিম আ. আবার মক্কায় এলেন স্ত্রী ও পুত্রকে দেখতে। ইসমাইল এখন হাঁটাচলা করার উপযোগী ফুটফুটে বালক।

আল্লাহ ইব্রাহিম আ. কে নির্দেশ দিলেন ইসমাইলকে আল্লাহর জন্য কুরবানি করতে। পিতা ও পুত্র আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। ইব্রাহিম আ. ধারালো ছুরি ইসমাইলের গলায় চালালেন তাকে কুরবানি করতে। আল্লাহ বেহেশত থেকে একটি ভেড়া পাঠিয়ে দিয়ে তা কুরবানি করতে বললেন। নবী ইব্রাহিম আ. ও ইসমাইল আ. কুরবানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর নবী ইব্রাহিম আ. এবং ইসমাইল আ. মিলে আল্লাহর ঘর কাবা নির্মাণ করলেন। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা মক্কায় আসে আল্লাহর বন্দেগী ও হজ্জ করতে।

অনুশীলনী ২৭

১। উত্তরের সঠিক অংশটি বৃত্ত দ্বারা আবৃত কর।

ক. আজরের এক পুত্র ছিল, যার নাম **ইব্রাহিম / ইসমাইল**

খ. ইব্রাহিম জানতেন যে, মূর্তি কারো কোন সাহায্য বা ক্ষতি করতে **পারে / পারে না**।

গ. ইব্রাহিম লোকদেরকে বললেন **মূর্তির / আল্লাহর** বন্দেগী না করতে ।

ঘ. ইব্রাহিম মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করলেন সবচেয়ে **ছোটমূর্তি / বড়মূর্তি** ছাড়া

ঙ. লোকেরা ইব্রাহিমকে বিশাল **অগ্নিকুণ্ডে / নদীতে** ফেলে মারার সিদ্ধান্ত নিল।

চ. আল্লাহ ইব্রাহিমকে রক্ষা করলেন আগুনকে **শীতল করে / নিভিয়ে** দিয়ে ।

ছ. নবী ইব্রাহিম আ. পৃথিবীর দেশে দেশে ভ্রমণ করেছেন আল্লাহর দিকে **ডাকার / ব্যাবসার** জন্য।

জ. নবী ইব্রাহিম আ. মক্কায় গিয়েছিলেন তার **পিতা / স্ত্রী** ও শিশু কে সাথে নিয়ে

ঝ. মক্কা ছিল বিশাল মরুময় **প্রান্তরের / জঙ্গলের** মধ্যে অবস্থিত

ঞ. আল্লাহ তাদেরকে জমজম **ঝর্ণার / নদীর** পানি দিয়ে সাহায্য করলেন

ট. আল্লাহ ইব্রাহিমকে **পরীক্ষা করতে / বিপদে ফেলতে** তাকে সন্তান কোরবানির নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঠ. আল্লাহ জান্নাত থেকে একটি **গরু / ভেড়া** প্রেরণ করলেন ইসমাইলের বদলা কুরবানি করতে।

ড. নবী ইব্রাহিম আ. এবং তার সন্তান **ইসহাক / ইসমাইল** কাবা নির্মাণ করলেন।

১। উত্তরের সঠিক অংশটি বৃত্ত দ্বারা আবৃত কর।

বাম পাশ	**ডানপাশ**
আজর	শীতল হলো
জমজম	আল্লাহর নবী
ইসমাইল	মক্কার একটি ঝর্ণা
ইব্রাহিম	ইব্রাহিমের পিতা
আগুন	ইব্রাহিমের সন্তান

নবী ইব্রাহিম আ. ও ইসমাইলে আ. এর বিস্তারিত জীবনী

পর্ব ১: মূর্তি পূজকের ঔরসে নবীর জন্ম

হাজার হাজার বছর আগের কথা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ইরাক দেশে ‘উর’ নামে এক নগরী ছিল। বিশাল নগরীর জনসংখ্যাও ছিল অনেক। ‘উর’ নগরে এক বিখ্যাত ব্যক্তি বাস করতেন, যার নাম ছিল আজর। আজর নিজ হাতে কাঠ ও পাথর খোদাই করে চমৎকার মূর্তি তৈরি করতেন। তারপর সেই সব মূর্তি লোকদের কাছে বিক্রি করতেন। এতে তার আয়-রোজগার ভালোই হতো। সেই শহরের অন্যান্য মানুষের ন্যায় আজরও ছিলেন মূর্তিপূজক। এ কারণে লোকেরা আজরকে অনেক সম্মান করতো।

সে নগরীর মধ্যস্থলে ছিল একটি বিরাট মন্দির। লোকেরা তাদের মূর্তি সেই মন্দিরে রাখত। সেখানে তারা দিন ও রাতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করত । নারী পুরুষ সকলেই মূর্তির

সামনে মাথা অবনত করত ও মূর্তির জন্য মূল্যবান উপহার পেশ করত। আজর ও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও মূর্তিগুলোর সামনে অবনত হতেন এবং তাদের পূজা করতেন।

সেখানে অনেক আকার আকৃতির মূর্তি ছিল। কিছু মূর্তি ছিল অনেক বড় আর কিছু অনেক ছোট আকৃতির। আবার কিছু ছিল মধ্যম আকৃতির। কিছু মূর্তি ছিল পাথরের তৈরি আর কিছু কাঠের। আর কিছু ছিল স্বর্ণের তৈরি। কিছু মূর্তি ছিল মানবাকৃতির আর কিছু বিভিন্ন ধরনের পশু আকৃতির। সেখানে কিছু মূর্তি ছিল বিশাল ও ভয়ঙ্কর দেও দানবের মতো। মূর্তিগুলো নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নড়াচড়া করার কোন ক্ষমতা ছিল না। এমনকি তাদের উপর কেউ কিছু ছুড়ে মারলেও তারা তার প্রতিবাদ করতে পারতো না।

আল্লাহ আজরকে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন যার নাম ইব্রাহিম। ইব্রাহিম অত্যন্ত মেধাবী এবং ভদ্র ছেলে। তার হৃদয় ছিল খুবই কোমল। কিন্তু কোন কিছু তার বুঝে না আসলে সে মানতে নারাজ। সকলেই তাকে ভালবাসে। যদিও ইব্রাহিম ছিলেন বয়সে খুবই ছোট কিন্তু আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা। আল্লাহ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে বানিয়েছিলেন সেই জাতির জন্য নবী।

নবী ইব্রাহিম আ. লক্ষ্য করলেন, লোকেরা মূর্তির সামনে অবনত হয় ও তাদের সামনে শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি জানতেন এ মূর্তিগুলো পাথর কিংবা কাঠের তৈরি। মূর্তিগুলো কিছু শুনেও না, কিছু দেখেও না এবং কিছু বলতেও পারে না। তিনি জানতেন, এই মূর্তিগুলোর কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তারা না কারো কোন উপকার করতে পারে আর না কারো কোন ক্ষতি করতে পারে। তিনি লক্ষ্য করতেন, মূর্তিগুলোর নাকের সামনে দিয়ে মশা-মাছি উড়ে যাচ্ছে এবং তাদের সম্মুখে রাখা খাবারগুলো ইঁদুর খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এসব মূর্তির কিছুই করার ছিল না। নিজেরাই চরম অসহায়। তাই তার মনে প্রশ্ন, মূর্তিগুলো কেমন করে মানুষের উপকার করতে পারে?

ইব্রাহিম আ. নিজেকেই প্রশ্ন করেন, *"কেন লোকেরা এইসব মূর্তির উপাসনা করে এবং কেনই বা তারা এদের কাছে প্রার্থনা করে? লোকেরা কেন তাদের প্রয়োজন এদের কাছে পেশ করে?"* তিনি ভাবেন, *"আমি বয়সে অনেক ছোট হতে পারি কিন্তু আমি লোকদের বলব যে, তোমাদের এই বোকামি কোন ভাবেই আমি মেনে নিতে পারছি না।"*

ইব্রাহিম আ. তার পিতার কাছে গিয়ে ভদ্রভাবে বললেন,আব্বাজান, আপনি কেন এসব মূর্তির উপাসনা করেন? কেন তাদের কাছে মাথা অবনত করেন? আব্বাজান, কেন আপনি এই সমস্ত মূর্তির কাছে আপনার প্রয়োজন পেশ করেন? এসব মূর্তি না কিছু দেখে, না কিছু শুনে, আর না কিছু বলতে পারে। এদের না আছে কাউকে সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা, না আছে কারো ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা। তারা নিজেরা কিছু খেতেও পারে না। কিন্তু কেন আপনি প্রতিদিন তাদের সামনে খাদ্য ও পানীয় পেশ করেন? আজর এতে রাগান্বিত হয়ে গেলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই

তিনি এই ছোট প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হলো তিনি এসব প্রশ্নের অর্থ কি তা বুঝতেও চাননি।

ইব্রাহিম আ. অন্যান্য লোকের সামনে গিয়েও একই ধরনের প্রশ্ন তুলে ধরলেন। তাদেরকে সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চাইলেন। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, এসব মূর্তি নিছক কাঠ ও পাথর ছাড়া কিছুই নয়। লোকেরা এসব মূর্তিকে উপাস্য গণ্য করে চরম বোকামি করছে। কিন্তু লোকেরা তার উপর প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হলো। তবে তাদের কেউই তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেনি। আর তারা তার প্রশ্নের মর্ম উপলব্ধি করতে ও সক্ষম হয়নি।

"তাহলে কিভাবে আমি লোকদেরকে প্রকৃত সত্য বুঝাতে পারি?" ইব্রাহিম আ. মনে মনে চিন্তা করলেন। এরপর তিনি নিজে থেকেই একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করলেন। *"লোকদের অনুপস্থিতিতে সুযোগ পেলে আমি এই মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করব।"* ইব্রাহিম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, *"কেবল তখনই তারা আমার কথার মর্ম বুঝতে পারবে। এ ছাড়া কোন বিকল্প নেই।"*

উপরের গল্প (পর্ব ১) থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষা গুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন,

- *মূর্তি কখনো খোদা হতে পারে না। এগুলো মানব তৈরি কিছু কল্পিত ছবি*
- *আল্লাহ ছাড়া যত কিছুকে মানুষ খোদা বলে বিশ্বাস করে, সবকিছুই মানুষের কল্পনা প্রসূত*
- *একটি মূর্তি জীবনহীন। তারা দেখতে, শুনতে, বলতে ও অনুভব করতে পারে না*
- *মূর্তি কাউকে সহযোগিতা করতে পারেনা ও কারো ক্ষতি করতে পারে না*
- *মূর্তিগুলো খুবই দুর্বল ও অসহায়, এমনকি মশা মাছির চাইতে দুর্বল ও অসহায়*
- *মানুষ মূর্তিকে রক্ষা করে, মূর্তি মানুষকে রক্ষা করতে পারে না অথচ নির্বোধেরা তাদের উপাসনা করে*
- *একজন মূর্তিপূজকের ঘরেও খুব দ্বীনদার সন্তান জন্ম নিতে পারে*
- *সত্যবাদী লোক যারা মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তারা মূর্তি পূজার অসারতা উপলব্ধি করতে পারে*
- *অনেক শিশু ছোটকাল থেকেই বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় বড়দের থেকে এগিয়ে থাকতে পারে*
- *শিশুরা সৎ, কারণ তারা তাই দেখে যা বাস্তব*
- *সত্য বলতে কখনো কাউকে ভয় করা উচিত নয়*
- *নবীরা শিশুকাল থেকেই পবিত্র এবং ধার্মিক হয়ে থাকেন*
- *নবীরা জন্মগত ভাবে সাহসী, ছোটকাল থেকেই তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না*

পর্ব ২: উৎসবের দিনে ইব্রাহিমের হাতে কুড়াল

বৎসরের বড় উৎসবের দিনটি সমাগত হল। সকলে মিলে তারা এ উৎসব উপভোগ করে। পরিবার-পরিজন নিয়ে সকলে শহর থেকে বেরিয়ে গেল উৎসবে যোগ দিতে। ইব্রাহিম আ. এর পিতা ও বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি ইব্রাহিম আ. কে প্রশ্ন করলেন, "কেন তুমি আমাদের সাথে উৎসবে যাচ্ছো না? এটা অত্যন্ত মজার উৎসব।" "না, ধন্যবাদ ! আমি যাব না। আমি ভালো নই।" ইব্রাহিম আ. উত্তর দিলেন।

ইব্রাহিম আ. ছাড়া সকলেই শহরের বাইরে চলে গেলো। সবাই উৎসবে মেতে উঠলো। ইব্রাহিম আ. এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি নিরবে শহরের সবচেয়ে বড় মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি মূর্তিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ওহে প্রাণহীন মূর্তিরা। তোমরা তো মানুষের হাতের তৈরি কিছু পাথর ও ধাতু ছাড়া কিছুই নও। আমি জানি, তোমরা কারো খোদা নও। যদি তোমাদের কোন শক্তি থাকে জবাব দাও।"

কিন্তু সেখানে ছিল নিস্তব্ধ নীরবতা। নীরবতা ভাঙবে এমন সামান্যতম কোন শব্দও সেখানে ছিল না। "কী হল তোমাদের? কথা বলছো না যে? তোমাদের সামনে মজার মজার খাবার পরে আছে, কিছু তো খাচ্ছ না? আর এই যে তোমাদের নাকের উপর দিয়ে মাছি উড়ে যাচ্ছে সেই মাছিটি সরাবার ক্ষমতা ও তোমাদের নেই?" ইব্রাহিম আ. এভাবেই মূর্তিগুলোর সামনে বিদ্রুপ ছুড়ে মারলেন।

ইব্রাহিম আ. বললেন, রাখো এখনই তোমাদের মজা শিখাচ্ছি। তিনি লোহার একটি কুড়াল হাতে নিলেন। তারপর এক এক করে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন, কেবল সবচেয়ে বড় মূর্তিটি ছাড়া। মন্দিরের ভিতরে কী যে এক অবস্থা এখন দেখা যাচ্ছে। কোথাও মূর্তির ভাঙা হাত আবার কোথাও পরে আছে মূর্তির বিচ্ছিন্ন মাথা ও পা। আহা! কি অসহায় এসব মূর্তিগুলো। তাদের না আছে নিজেদের রক্ষার কোন ক্ষমতা আর না আছে কারো কাছে অভিযোগ করার কোন যোগ্যতা। ইমরাহীম আ. আরো একবার মূর্তিগুলোকে ধিক্কার দিলেন । অতঃপর তিনি তার হাতের কুড়ালটি বড় মূর্তির কাঁধে ঝুলিয়ে সেখান থেকে নিরবে বেরিয়ে এলেন।

পর্ব ৩: আগুন হলো ফুলবাগিচা

উৎসব সমাপ্ত হলো। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। লোকেরা উৎসব থেকে ফিরে এসে সরাসরি মন্দিরে চলে গেল। উৎসবের এই দিনটিতে মূর্তিগুলোর সামনে তারা একবার হলেও অবনত হয়ে উপাসনা করবে। এ আশায় তারা মন্দিরের দরজা খুলল। কিন্তু ভিতরে ঢুকে তারা তো হতবাক। তারা বলতে লাগলো, "এ কী হল এখানে? কে এসব মূর্তি ভেঙেছে? হায়! হায়! কে এমন মহা সর্বনাশ করেছে? এখন আমাদের কী হবে? এই সকল মূর্তির অভিশাপে আমরা তো ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন কে এসব ঘটিয়েছে?"

এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ধারণা এসব ইব্রাহিম এর কান্ড।' তাকে সর্বদা এসব মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনেছি। সে ছাড়া আর কেউ এটা করতে পারে না। লোকেরা ইব্রাহিমকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে এলো।

কিন্তু ইব্রাহিম আ. ছিলেন খুবই সাহসী, তিনি মোটেই ঘাবড়ে যাননি। তাছাড়া এগুলো ভাঙ্গার পূর্বেই তিনি জানতেন, তার উপর কী বিপদ আসতে পারে। কিন্তু এসব বিপদের ভয়ে তিনি শংকিত নন। ইব্রাহিম আ. বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তার সাথে আছেন। লোকেরা ধমক দিয়ে

জিজ্ঞেস করল, “ইব্রাহিম তুমি কি সেই ব্যক্তি, যে আমাদের দেবতাদের সাথে এমন আচরণ করেছে?”

ইব্রাহিম আ. বড় মূর্তির দিকে ইশারা করে বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করো দেখো না? সে তো এখনো অক্ষত আছে এবং সে এখানে উপস্থিত ছিল? তার চোখের সামনেই সবকিছু ঘটেছে? লোকেরা জানত, মূর্তিগুলো পাথরের তৈরি এবং এগুলো কোন কিছু শুনতেও পায় না, দেখতেও পায়না এবং বলতেও পারে না। তারা জানতো, তাদের বড় মূর্তির অবস্থাও অন্যদের মতোই। “তুমি নিজেও জানো, এসব মূর্তি আসলে কথা বলতে পারে না, তাহলে কেন এদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলছো?” তারা ইব্রাহিমকে পাল্টা প্রশ্ন করল।

ইব্রাহিম আ. তাদের মুখ থেকে এগুলো শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা যখন একমত যে, এসব মূর্তি কোন কথা বলতে পারে না এবং নিজেদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না, তাহলে আমার প্রশ্ন তোমরা কেন এদের উপাসনা করছো? এবং কেনই বা বিশ্বাস করছ এসব মূর্তি তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে? কিংবা বিপদে তোমাদেরকে সাহায্য করে? তোমাদের কি আসলে বুদ্ধি জ্ঞান বলতে কিছু আছে? লোকেরা মূর্তির মতই নিরব হয়ে কথাগুলো শুনছিল কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারছিল না। তারা তাদের বোকামি বুঝতে পারলেও অহংকারের কারণে তা মেনে নিতে পারছিল না। তাই তারা ইব্রাহিমের উপর রেগে ফেটে পড়লো।

এক ব্যক্তির চিৎকার করে উঠল, “দেবতাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নাও।” সাথে সাথেই লোকেরা ইব্রাহিম আ. কে ধরে বেঁধে ফেলল। “তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে দেবতাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নাও।” লোকেরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো। যেমন কথা তেমন কাজ। লোকেরা বড় একটা আগুনের কুণ্ডলী তৈরি করল। এটা ছিল এত বিশাল আগুনের কুণ্ডলী যে কোন পাখি উপর দিয়ে উড়ে গেলেও তা পুরে ছাই হয়ে যেত। এরপর তারা একটি চরকার সাহায্য দূর থেকে ইব্রাহিমকে আগুনের মধ্যখানে ফেলে দিল।

কিন্তু ইব্রাহিম আ. ভীত ছিলেন না। তার ছিল আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তিনি জানতেন, তিনি যা করেছেন তা আল্লাহর জন্যই করেছেন। তিনি তা করেছেন মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ করার জন্য এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং তিনি আল্লাহর সাহায্য পাবেনই। সত্যিই আল্লাহর সাহায্য ইব্রাহিম আ. এর জন্য চলে এলো। আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দিলেন, “হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।”

আল্লাহর সৃষ্ট আগুনের আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার সাধ্য নেই। আগুন হয়ে গেল ইব্রাহিমের জন্য শান্তিময় ফুলের বাগান। কিন্তু লোকেরা বিশ্বাস করতে পারছিল না, কেন আগুন ইব্রাহিমকে পোড়াচ্ছে না। এমনকি আগুন ইব্রাহিমের একটি লোম পর্যন্ত পুড়ালো না। ইব্রাহিম আ. নিরাপদে আগুনের কুন্ডলি থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন।

লোকেরা বিস্ময়ে অভিভূত। কোন কিছুই তাদের বুদ্ধিতে আসছে না। এটা কেমন করে সম্ভব যে, আগুন একজন ব্যক্তিকে পুড়াতে পারলো না। লোকেরা স্বচক্ষে আল্লাহর ক্ষমতা দেখতে পেল আর দেখতে পেল ইব্রাহিমের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের নিদর্শন। কিন্তু নির্বোধ লোকেরা এত কিছু দেখেও সত্য কে মেনে নিতে পারলো না। মূর্তি পূজা তাদেরকে দুনিয়ার প্রতি লোভী বানিয়েছে। তারা তাদের যশ খ্যাতি খুঁজে প্রায় মূর্তি পূজার আড়ালে। ফলে সত্য গ্রহণে তারা হয়ে উঠেছে অনাগ্রহী।

উপরের গল্প (পর্ব ২ ও ৩) থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষা গুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন,

- *নবী ইব্রাহিম আ. কে বলা হয় খালিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহ তাকে অনেক পরীক্ষা করে বন্ধু বানিয়েছেন*
- *আল্লাহ সব লোককেই বুঝার যোগ্যতা দেন কিন্তু কখনো কখনো লোকেরা সঠিক জিনিস বুঝা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে*
- *লোকেরা অনেক সময় সত্য গ্রহণ করে না কেবল এ কারণেই যে, এর ফলে তারা দরিদ্র হয়ে যাবে, সমাজে তাদের সম্মান ও পদমর্যাদা কমে যাবে কিংবা তাদেরকে অসংখ্য শক্তিশালী লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে*
- *অনেক সময় জালিম শাসকের অত্যাচারের ভয়ও সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে*
- *মানুষকে কেবল তখনই বিশ্বাস করতে পারে, যখন তারা স্বেচ্ছায় সত্য গ্রহণ এগিয়ে আসে*
- *কেবল সবচেয়ে অনড় অবিশ্বাসীরাই তাদের কাছে প্রমাণ আসার পরেও অস্বীকার করে*
- *তারা সত্য বুঝে কিন্তু সত্যটাকে গোপন রাখে আর এই গোপন রাখার অপর নাম হল কুফুর*
- *বিশ্বাস কখনো অলৌকিক কিছু দেখার উপর নির্ভর করে না, কারণ অহংকারবশত অস্বীকারকারীরা অলৌকিক দেখেও ঈমান আনে না।*
- *প্রকৃত সত্যসন্ধানীরা সত্য বুঝার পরই তা বিশ্বাস করে, তাদের জন্য কোন অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন হয় না*
- *জেদি লোকেরা কখনো ন্যায় সঙ্গত হয় না, তারা অধিকাংশ সময়েই সহিংসতার আশ্রয় নেয়*
- *লোকদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত উদাহরণের প্রয়োজন পড়ে*
- *নবীরা কখনো সম্পদ জনপ্রিয়তা বা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষী হন না তারা সবসময়ই কামনা করেন লোকেরা যেন এক আল্লাহর বন্দেগী করে*
- *আল্লাহ সব সময় তাদেরকে রক্ষা করেন, যারা তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে এবং তার দিকে লোকদেরকে আহ্বান করে*
- *আল্লাহ সকল জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন*
- *আল্লাহ যা ক্ষতিকর তাকে উপকারী করতে পারেন এবং যা উপকারী তাকে ক্ষতিকর বানাতে পারেন*

পর্ব ৪: অজানার পথে হিজরত

সেকালে নমরুদ নামে এক অত্যাচারী বাদশা ছিল। তার রাজধানী ছিল মাসুল শহরে। তবে সে অনেক বিস্তৃত অঞ্চলের শাসক ছিল। উর নগরীর বাসিন্দারাও তার শাসনের অধীনে ছিল। তার শক্তি, দাপট ও অত্যাচারের ভয়ে লোকেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতো। লোকেরা তাকে তাদের রব গণ্য করতো ও তার উপাসনা করতো।

নমরুদের কাছে ইব্রাহিম আ. এর এক আল্লার দাওয়াতের কথা পৌঁছলে নমরুদ ক্ষিপ্ত হল। ইব্রাহিম আ. কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নমরুদ তাকে ডেকে পাঠালো। ইব্রাহিম আ. ছিলেন

নির্ভীক। তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিন্দুমাত্র ভয় করতেন না। তিনি বুকে অদম্য সাহস নিয়ে নমরুদের দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। প্রথমেই তিনি নমরুদকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তার বন্দেগীর দাওয়াত দিলেন। কিন্তু অহংকারী নমরুদ তা প্রত্যাখ্যান করল। তারপর নমরুদ তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞেস করল, "কে তোমার রব, হে ইব্রাহীম?" ইব্রাহিম আ. শান্তভাবে জবাব দিলেন, "আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ।" এ উত্তরে নমরুদ চরম অসন্তোষ প্রকাশ করল। তারপর সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, "আল্লাহ আবার কে? কি তার পরিচয়?"

ইব্রাহিম আ. জবাব দিলেন, "তিনি এক, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন।" নমরুদ সাথে সাথে বলে উঠলো, "হ্যাঁ, ভালো কথা। আমিও তো জীবন এবং মৃত্যু দান করতে পারি। তোমাকে এখনই তা আমি দেখিয়ে দেব।" তারপর দুজন কায়েদিকে তার সামনে এনে হাজির করা হলো। সে তাদের একজনকে হত্যার আদেশ দিল এবং তাকে হত্যা করা হলো। আর অপরজনকে সে মুক্তি দিয়ে দিল। তারপর সে অহংকার এর সাথে বলল, "দেখো, কিভাবে আমি জীবন দেই এবং মৃত্যুদান করি।"

নমরুদ খুবই বোকামির পরিচয় দিল। এটা ছিল আল্লাহর ক্ষমতার সাথে খুবই হালকা একটা তুলনা। আর অবিশ্বাসীরা সাধারণত এ ধরনের নির্বোধ হয়ে থাকে। আর এটা এমন সকল লোকদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করে। কিন্তু ইব্রাহিম আ. চাইলেন, বাদশা নমরুদকে একটি যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে। তিনি চাইলেন, নমরুদ সহ সকলকে বুঝিয়ে দিতে যে, আল্লাহর শক্তির সাথে অন্য কারো কোন তুলনা হয় না এবং আল্লাহ যা করতে পারেন, তা আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই তিনি বাদশার উদ্দেশ্যে বললেন, "আমার আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত করেন।"

এ উত্তম শুনে নমরুদ নির্বাক হয়ে গেল। সে এর প্রত্যুত্তরে কিছুই বলতে পারল না। কিন্তু অহংকারী নমরুদ এবার ইব্রাহিম আ. এর উপর আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ইব্রাহিম আ. ভাবলেন, এখন করনীয় কী। তিনি দেখলেন, তার আপন পিতা তার উপর অসন্তুষ্ট। তার শহরের লোকজন তার উপর প্রচনভাবে রেগে আছে। এমনকি এখন দেশের বাদশাও তার ওপর চড়াও। গোটা পরিবেশ এখন তার প্রতিকূলে। তার দাওয়াত এ অঞ্চলে কার্যকর হচ্ছে না। এদিকে তার উপর দেশ ছাড়ার চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। তাই ইব্রাহিম আ. সাল্লাম সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি অন্য কোথাও চলে যাবেন। নতুন স্থানে গিয়ে লোকদেরকে এক আল্লাহর দাওয়াত দিবেন। তিনি তার জন্মভূমিকে বিদায় জানিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

পর্ব ৫: মরু প্রান্তরে মা ও শিশু

নবী ইব্রাহিম আ. দাওয়াতি কাজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটে চললেন। মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও তার আশপাশের বহু দেশে তিনি ঘুরে ঘুরে লোকদেরকে এক আল্লাহর দাওয়াত দিলেন। কিছু লোক তার দাওয়াতে সাড়া দিলেও অধিকাংশ লোকই তার বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্রোহ

গড়ে তুলল।

আল্লাহ এখন তাকে মরুভূমির মধ্যস্থিত মক্কায় ভ্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে নবী ইব্রাহিম আ. তার স্ত্রী হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সে সময় মক্কাতে কোন জনমানব ছিল না। ছিল না কোন গাছ-গাছালি কিংবা পানির উৎস। এমনকি সেখানে কোন পশু পাখি ও খুঁজে পাওয়া যেত না। জীবন বাঁচানোর কোন উপাদানই সেখানে ছিলোনা। প্রচন্ড গরম ও মরুময় ভূমিতে কিছু বালু এবং পাথরের উঁচু পাহাড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আ. কে বললেন, তোমার স্ত্রী এবং শিশু পুত্র ইসমাইলকে এখানে রেখে চলে যাও। অন্য স্থানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে ইসলামের দাওয়াত দাও। ইব্রাহিম আ. এর ছিল আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তিনি কোন চিন্তা না করেই স্ত্রী এবং শিশুকে রেখে আবার দাওয়াতি কাজে বেরিয়ে পড়লেন। পিছন থেকে স্ত্রী ডেকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি কি আমাদের এখানে স্থায়ীভাবে রেখে চলে যাচ্ছেন? আল্লাহ কি আপনাকে এমনটি করতে নির্দেশ দিয়েছেন?

নবী ইব্রাহিম আ. এবার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি চলে যাচ্ছি। আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রাখো। বিবি হাজেরা ছিলেন খুবই ধার্মিক এক মহিলা। আল্লাহর উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা। তাই তিনি জবাব দিলেন, যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আমাদের জন্য একটা বিহিত ব্যবস্থা করবেন।

দু-একদিনের মধ্যেই সঙ্গে থাকা খাদ্য এবং পানীয় ফুরিয়ে গেল। শিশু ইসমাইল পানির জন্য ছটফট করছেন। বিবি হাজেরা পানির সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন। তার নিকটবর্তী একটি পাহাড় ছিল সাফা আর ওপর দিকে ছিল আরেকটি পাহাড় মারওয়া। কিন্তু কোথাও তিনি পানির ন্যূনতম কোন উৎস খুঁজে পেলেন না।

পানির সন্ধানে তিনি একবার সাফা পাহাড়ে, আরেকবার মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে দূর দূরান্তে তাকিয়ে দেখেন কোন কাফেলা আসছে কিনা। এভাবে তিনি প্রায় সাতবার এ পাহাড় থেকে ওপাহাড়ে দৌড়ালেন। অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন সন্তানের কাছে। তিনি এখন অবাক। দেখেন সন্তানের পায়ের আঘাতে নিচ থেকে পানি জমজম করে বের হয়ে আসছে। পানি বের হচ্ছে আর চতুর্দিক প্লাবিত করছে। হাজেরা তখন বালু এবং পাথর দিয়ে কূপের চতুর্দিক বন্ধ করে পানি আটকানোর চেষ্টা করলেন।

সুপেয় পানির সে উৎসটি আজও জমজম কূপ নামে খ্যাত। হজ্জ ও ওমরা উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলে সেখানে লোকেরা তৃপ্তির সাথে জমজম পানি পান করে। অনেকে সেই পানি নিজ দেশে নিয়ে আসে। জমজম পানি সকল মুসলমানের কাছে একটি বরকতময় পানি হিসেবে সমাদৃত।

উপরের গল্প (পর্ব ৪ ও ৫) থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষা গুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন,

- *কেবল আল্লাহই জীবন এবং মৃত্যু দিতে পারেন, একমাত্র আল্লাহই তার সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন*
- *যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাদেরকে অপদস্ত করেন এবং তিনি বিশ্বাসীদের সম্মানিত করেন*
- *অহংকারী শাসকরা বুঝাতে চায় তারা খুবই ভালো, কারণ অসংখ্য বোকা এবং নির্বোধরা তাদেরকে অনুসরণ করে*
- *দুষ্টু শাসকের ক্ষমতা এতই দুর্বল যে, একটা ছোট শিশুর কথাও তাকে ভীত করে তুলে*
- *অত্যাচারী শাসক সত্যকে ভয় করে, কারণ সত্য প্রকাশিত হলে তাদের দুর্বলতা লোকেরা বুঝে ফেলবে*
- *যারা আল্লাহর বন্দেগী করে না, তারা এমন কথা বলে ও এমন কাজ করে, যা তাদের বোকামি প্রকাশ করে*
- *ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা নবীদের গুণাবলি এবং অধৈর্য ও বোকামি হচ্ছে অবিশ্বাসীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য*
- *কেউ বিশ্বাস করতে না চাইলে, চাপাচাপি না করে অন্য লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া উচিত*
- *ইসলাম অনুসরণ করতে বাধাগ্রস্ত হলে আমাদেরকে এমন স্থানে হিজরত করা উচিত যেখানে বাধা নেই*
- *শুষ্ক মরু প্রান্তর ভালো যদি সেখানে আল্লাহর বন্দেগী করা যায়, সেই স্থানের চাইতে যেখান ফুলে ফলে সজ্জিত কিন্তু আল্লাহর বন্দেগী করা যায় না*
- *আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতে কখনো আমাদেরকে সবচেয়ে প্রিয়দেরকেও ছেড়ে দূরে যেতে হয়*
- *আল্লাহ তাদের পরিবারকে রক্ষা করেন, যারা অন্য লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে*
- *আল্লাহ সেই সব লোকদের পরিবার-পরিজনকে এমনভাবে রিজেক্ দেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারে না, যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকে*
- *বিশ্বাসী নারী পুরুষ সকলের উচিত আল্লাহর উপর সবসময় পূর্ণ আস্থা এবং নির্ভরশীলতা রাখা*
- *জমজম কূপের পানি একটি বরকতময় পানি, যা পাঁচ হাজার বৎসর থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে*

পর্ব ৬: পিতার হাতে পুত্র কুরবানি

দেখতে দেখতে শিশু ইসমাইল এখন সুদর্শন ও বুদ্ধিদীপ্ত এক সুঠাম কিশোর। বিভিন্ন কাজে মাকে সহযোগিতা ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে হেসে খেলে তার দিন কাটে। অনেকদিন পর নবী ইব্রাহিম আ. মক্কা এলেন তার স্ত্রী ও পুত্রকে দেখতে। আহা সকলেরই চোখে মুখে কি যে আনন্দ। জান্নাতি পরিবেশে একে অন্যকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা জানালেন।

নবী ইব্রাহিম আ. তার পুত্র ইসমাইল কে অনেক ভালোবাসেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে, ৯০ এর কাছাকাছি বয়সে আল্লাহ তাকে এই পুত্র সন্তান দিয়েছেন। তিনি আশা করছেন, এই পুত্রই তার নবুয়াতি মিশনকে অব্যাহত রাখবে। পিতাকে পেয়ে ইসমাইল আনন্দে আত্মহারা। পিতা পুত্র একসাথে খাওয়া-দাওয়া ও ঘোরাফেরা করছেন। কখনো একসাথে পাহাড়ে উঠা, কখনো বা একসাথে দৌড়াদৌড়ি। আহা কি যে এক জান্নাতি পরিবেশ। পিতা পুত্রের ভালোবাসার এ বন্ধন অতুলনীয়। নবী ইব্রাহিম আ. জানতেন, পুত্রের প্রতি ভালোবাসা কখনো আল্লাহর ভালবাসার উপর প্রাধান্য পাবে না।

আল্লাহ এবার সিদ্ধান্ত নিলেন নবী ইব্রাহিম আ. কে পরীক্ষা করতে। এ পরীক্ষা ভালোবাসার পরীক্ষা। ইব্রাহিম আ. কি সত্যিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন নাকি অন্য কিছুকে?

তার পুত্রের প্রতি ভালোবাসা কি আল্লাহর ভালোবাসার চেয়ে বেশি? আল্লাহ তা দেখতে চান। তাই আল্লাহ ইব্রাহিম আ. কে নির্দেশ দিলেন তার একমাত্র প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর জন্য কুরবানি করতে। আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এ শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ যাই নির্দেশ দেন তাই মাথা পেতে নিতে হবে এবং আল্লাহর সকল নির্দেশ বাস্তবায়নের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

ইব্রাহিম আ. আল্লাহর নির্দেশের কথা ইসমাইলের কাছে পেশ করলেন। বললেন, প্রাণ প্রিয় পুত্র আমার! আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে আল্লাহর জন্য কুরবানি করতে। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে কি? ঈমানের আলোয় দীপ্ত ইসমাইল সানন্দে জবাব দিলেন, আল্লাহ আপনাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তাই করেন, আমাকে আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। নবী ইব্রাহিম আ. এবার ইচ্ছামত একটি ছুরি ধারালেন। তারপর এক হাতে সেই ধারালো ছুরি এবং অন্য হাতে ইসমাইলকে ধরে কোরবানীর স্থানে নিয়ে গেলেন।

শয়তান সকল ভালো কাজেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এখানেও শয়তান বাধা হতে চাইলো। সে কানে কানে ইসমাইল কে বলল, কেনই বা নিজের জীবনটা এভাবে দিতে যাচ্ছ। সবকিছুতেই কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতে হবে? তার চেয়ে বরং এখান থেকে পালিয়ে যাও। ঈমানের বিশ্বাসে বলীয়ান ইসমাইল শয়তানের প্ররোচনা বুঝতে পারলেন। তিনি হাতে কিছু কঙ্কর নিয়ে শয়তানের দিকে ছুড়ে মারলেন। কঙ্করগুলো শয়তানের মাথায় আঘাত করলো আর শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

নবী ইব্রাহিম আ. এবার প্রিয়তম পুত্র ইসমাইলের চোখ বেঁধে নিলেন। তারপর তার মুখ নিচের দিকে রেখে তাকে শুইয়ে দিলেন। তিনি ধারালো চুরি হাতে নিয়ে ইসমাইলের গলা কাটতে প্রস্তুত। কিন্তু না ছুরি দিয়ে ইসমাইলের গলা আর কাটা হলো না। জান্নাত থেকে একটি ভেড়া আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ বললেন, হে ইব্রাহীম! তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো। জান্নাতি ভেড়াটি ইসমাইলের বদলা কুরবানি করে নাও। আল্লাহ এখানে নিষ্ঠুরতা দেখতে চাননি। চাননি ইসমাইলের রক্ত প্রবাহিত হোক। তিনি শুধু দেখতে চেয়েছিলেন ইব্রাহিম আ. আল্লাহর জন্য সন্তান কুরবানি করতে প্রস্তুত কিনা। আর ইসমাইল প্রস্তুত কিনা নিজেকে আল্লাহর জন্য সঁপে দিতে। পিতা পুত্র দু'জনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন । আল্লাহ উভয়ের উপরই সন্তুষ্ট হলেন। ইব্রাহিম আ. এবারও প্রমাণ করলেন, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। আর আল্লার ইচ্ছার সম্মুখে সবকিছু সোপর্দ করে দেয়ার মধ্যেই ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব।

পিতা পুত্রের এই অসাধারণ উৎসর্গ আল্লাহর কাছে খুবই গ্রহণীয় হলো। তাই আল্লাহ মুসলমানদের জন্য এই বিষয়টিকে অনুকরণীয় করলেন। আল্লাহ নির্দেশ দিলেন মুসলমানগণ যেন নবী ইব্রাহিম আ. এর অনুসরণে প্রতিবছর ঈদুল আযহায় একটি পশু কোরবানী করে, যাদের পশু কোরবানির সামর্থ্য রয়েছে। আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আ. এর মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দিন এবং তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে চিরস্থায়ী করুন।

পর্ব ৭: হে আল্লাহ! কবুল করো

ইব্রাহিম আ. দ্বিতীয় বারের মতো পরিবার ছেড়ে আবারও দাওয়াতি কাজে বেরিয়ে পড়লেন। বেশ কিছুদিন দেশ থেকে দেশান্তরে দাওয়াতি কাজ করে আবারো তিনি মক্কায় ফিরে এলেন। এবার এসে তিনি মক্কায় কাবা ঘর পুন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন। নবী নুহ আ. এর সময়কার প্লাবনে কাবা ঘরের দেয়াল গুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং শুধু তার ভিত্তি টিকে ছিল। ইব্রাহিম আ. সেই ভিত্তির ওপর নতুন করে কাবা নির্মাণ করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। আর এই কাজে তার সবচেয়ে বড় সহযোগী হবেন তার প্রিয় সন্তান ইসমাইল।

পিতা পুত্র পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ করলেন। তারপর বালু এবং কাদামাটি মিশিয়ে সেই পাথরগুলোকে একটির উপর আরেকটি রেখে ওয়ালগুলো নির্মাণ করতে লাগলেন। ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমের পর কাবা ঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলো। পিতা পুত্র যখনই কিছু নির্মাণ কাজ করতেন সাথে সাথে দুয়া করতেন, "হে আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে এই কাজকে কবুল করে নাও। আপনি আমাদের দুয়া শ্রবণ করুন, কারণ আপনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।"

আল্লাহ তাদের সেই খেদমত ও দুয়া কে কবুল করলেন। আল্লাহ কাবাকে করলেন বরকতময়। আর মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিলেন সেই কাবার দিকে মুখ করে তারা যেন প্রতিদিন ৫ বার সালাত আদায় করে। আর নবী ইব্রাহিম আ. সেই কাবায় দাঁড়িয়ে দুনিয়ার লোকদেরকে হজের আহ্বান জানালেন। সেই আহ্বান যাদের অন্তরে ছুয়েছে তারা একদিন না একদিন কাবায় গিয়ে হজ করবেই। *"হে আল্লাহ শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন নবী ইব্রাহিম আ. ও নবী ইসমাইল আ. এর প্রতি।"*

উপরের গল্প (পর্ব ৬ ও ৫) থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষা গুলো শিক্ষক/অভিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন,

- *নবীরা তাদের সন্তানদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তবে সে ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার চাইতে বড় নয়*
- *পিতারা তাদের সন্তানের সাথে খেলাধুলা করবে, তাদেরকে বিশেষ সময় দেবে*
- *শিশুদের সাথে সময় ব্যয় করা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মজবুত বন্ধন তৈরি করে*
- *আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকবে, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আমাদের জীবন ও মরণের মালিক*
- *যে আল্লাহকে ভালবাসে সে আল্লাহর অনুসরণ করতে কখনোই পিছপা হয় না*
- *শয়তান সর্বদা আমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখতে চায় এবং তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো ব্যক্তিগত স্বার্থ*
- *শয়তানকে পরাজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো তার কুমন্ত্রণায় কান না দেয়া*
- *শিশুরা অনেক সময় বিশ্বাস ও কর্মে বড়দের চাইতেও শক্তিশালী হয়ে থাকে যেমন ছিলেন শিশু ইসমাইল*
- *আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কিছুই সংঘটিত হয় না, এমনকি একটি ছুরিও গলা কাটতে পারে না*
- *আল্লাহ চাননি ইব্রাহিম আ. তার সন্তানের গলা কাটুন এবং তিনি ইসমাইলের রক্ত প্রবাহিত হওয়াও চাননি বরং তিনি চেয়েছেন আল্লাহর প্রতি ইব্রাহিমের ভালোবাসা এবং ইসমাইলের আত্মত্যাগ পরীক্ষা করতে*
- *আমরা প্রতি বৎসর ঈদুল আযহার দিনে পশু কোরবানির মাধ্যমে নবী ইব্রাহিম আ. এর সত্যের জন্য উৎসর্গকে স্মরণ করি*
- *কা'বা হল পৃথিবীতে প্রথম মসজিদ, প্রথম ঘর, যা আল্লাহর এবাদতের জন্য তৈরি হয়েছে*
- *নবী ইব্রাহীম আ. এবং ইসমাইল আ. কা'বা নির্মাণ করেছিলেন*
- *আল্লাহ তার সত্যবাদী বান্দাদেরকে বরকত দান করেন এবং তাদের কাজগুলো গ্রহণ করে*

অনুশীলনী ২৮

১। নিচের উলটপালট শব্দগুলোকে সাজিয়ে প্রতিটি ঘরে একটি করে বাক্য তৈরী করো।

এক ছিল অজরের যার ইব্রাহিম নাম পুত্র

থেকেই ছোটকাল ইব্রাহিম খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন সাহসী ও

মূর্তিগুলোকে ইবরাহীম ভেঙে করলেন চুরমার

কিছুই মূর্তিগুলো বলতে পারে না দেখতে, শুনতে ও

আরামদায়ক আল্লাহ ইব্রাহিমের করলেন আগুনকে জন্য

ও ইসমাইল আ. নবী ইব্রাহিম আ. নির্মাণ কা'বা করলেন

সিরাতুন নবী
(মুহাম্মদ সা. এর জীবন চরিত)

শিক্ষক ও অভিভাবক:

কালিমা শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে মুহাম্মদ সা. হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। কিন্তু এই কথাটির প্রকৃত অর্থ কি এবং কেন তা ইসলামে এত গুরুত্বপূর্ণ?

এই ঘোষণার মাধ্যমে মূলত ঐতিহাসিক একটি বিষয়কে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে হযরত ঈসা আ. এর পরে আল্লাহ যাকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ সা। অন্যান্য নবী এবং রাসূলদের মতো তিনি কেবলই একজন রসূল ছিলেন না বরং তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ রাসূল এবং তার মাধ্যমে দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে আল্লাহ পাক তার সর্বশেষ বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।

নবী মুহাম্মদ সা. এর পরে দুনিয়াতে আর কোন নবী আসবেন না এবং আর কোন আসমানী কিতাব ও নাজিল হবে না। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ বাণী। এই বাণীকে অবিকৃত রাখা এবং সকল মানুষের জন্য পথ নির্দেশক হিসেবে রেখে দেয়া আল্লাহপাকের নিজের দায়িত্ব। তাই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এ বাণীকে কেউ বিকৃত করতে পারবেনা। অতীতের আসমানি কিতাবগুলোর কিছু অংশ হয়তো হারিয়ে গিয়েছে, না হয় দুষ্ট লোকদের দ্বারা বিকৃত হয়েছে অথবা মানুষের বাণীর সাথে মিশে গিয়ে তা অনুসরণের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। কুরআন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ১৪ শত বছর আগের নাযিলকৃত কুরআন আজও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে বিদ্যমান। আজও যে কেউ আল্লাহ পাকের দিক নির্দেশনা পেতে চায়, কোরআন তার কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর বাণীগুলো পৌঁছে দিতে পারে।

'মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল' এই কথার মাধ্যমে এটা বুঝানো হয়েছে, ইসলাম হচ্ছে এমন একটি জীবন পদ্ধতি যা তথ্য এবং বাস্তব দু'দিক থেকেই পরিপূর্ণ। কুরআন যেখানে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ বাণী এবং মানুষের প্রতি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা, সেখানে নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবন হচ্ছে মানবতার জন্য সর্বশেষ বাস্তব উদাহরণ। কিভাবে আল্লাহর বাণীকে বাস্তব জীবনে মানতে হয় তা তিনি তার কর্মের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন। যখন আয়েশা রা. প্রশ্ন করা হয়েছিল, নবীজির আমল-আখলাক ও চরিত্র কেমন ছিল? জবাবে তিনি বলেছিলেন, তার আমল-আখলাক এবং চরিত্র হলো কুরআন। তার মানে কেউ যদি নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবনকে অস্বীকার করে পকারান্তরে সে কুআনকে অস্বীকার করছে। আর কেউ যদি কুরআনকে অস্বীকার করে তাহলে প্রকারান্তরে সে কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি নবী মুহাম্মদ সা. কে অস্বীকার করছে।

পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা

শিশুমনে দ্বীনের আলো ২ তে সিরাতুন নবী বিষয়ে যা আলোচিত হয়েছে, নতুন আলোচনায় যাওয়ার আগে তা এক নজর দেখে নেয়া উচিত।

নবী মুহাম্মদ সা. ও তার জন্ম

মরুভূমির দেশ আরব। আরবের লোকেরা মরুভূমির মধ্যেই জীবন যাপন করতো। তারা ছিল মূর্তি পূজারী। নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে তারই উপাসনা করতো। আরবের লোকেরা ছিল খুবই অসভ্য। তারা দরিদ্র, দুর্বল এবং এতিমদের প্রতি ছিল অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর। সেই আরব দেশেই জন্ম হলো এক নবীর। নাম তার মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সময়টি ছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাস। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ তাঁর জন্মের আগেই মারা যান। তাঁর মায়ের নাম ছিল আমিনা। আর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন আরবদের সর্দার। মক্কার লোকেরা শিশু জন্মের পর প্রতিপালনের জন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিত। তারা মনে করত, গ্রামের পরিবেশ শিশুদের উন্নত ভাষা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধাত্রী হালিমার কোলে গ্রামের পরিবেশে বড় হতে লাগলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর আচার-ব্যবহার এবং চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত ও প্রশংসিত।

নবী মুহাম্মদ সা. এর যৌবনকাল

নবী মুহাম্মদ সা. প্রিয় মা আমেনার সাথে মাত্র দুই বছর অবস্থান করলেন। যখন মুহাম্মদ সা. এর বয়স ছয় বৎসর হল, মা আমেনা তাকে নিয়ে মদিনায় বেড়াতে গেলেন। আমেনার পরিবার পরিজন মদিনায় বসবাস করতেন। মদিনা থেকে ফিরে আসার পথে মা আমিনা মৃত্যুবরণ করলেন। অসহায় শিশু মুহাম্মদ সা. আমেনার সফর সঙ্গী দাসীর সাথে মক্কায় চলে এলেন। মুহাম্মদ সা. এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই আব্দুল মুত্তালিবও মারা গেলেন, যখন নবী মোহাম্মদ সা. মাত্র ৮ বছরের শিশু। এরপর নবী মুহাম্মদ সা. এর চাচা আবু তালেব তার দেখাশোনা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলেন। আবু তালেব আপন ভাতিজা নবী মুহাম্মদ সা. কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ১২ বছর বয়সে আবু তালেব মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া গেলেন। যাত্রাপথে তারা বাহিরা নামক এক খ্রিষ্টান পাদ্রির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। পাদ্রী বাহিরা মুহাম্মদ সা. কে সর্বশেষ নবী হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

নবী হলেন যখন

যুবক মুহাম্মদ সা. পেশায় ছিলেন একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং বিশ্বস্ত। খাদিজা নামক এক ধনী বিধবা মহিলার ছিল বিশাল ব্যবসা। খাদিজা তার

ব্যাবসার কাজে মুহাম্মদ সা. কে নিয়োগ করলেন। খাদিজা মুহাম্মদ সা. এর বিশ্বস্ততা ও কর্ম দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। খাদিজা বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে মুহাম্মদ সা. তাকে বিবাহ করেন। খাদিজার গর্ভে মুহাম্মদ সা. ছয় সন্তান লাভ করেন। এক পর্যায়ে নবী মুহাম্মদ সা. হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন হতে লাগলেন। একদিন ফেরেশতা জিব্রীল আ. প্রথম ওহী নিয়ে তাঁর কাছে আসলেন। নবী মুহাম্মদ সা. প্রথমে ভয় পেলেন এবং খাদিজার কাছে ছুটে গেলেন। তার প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা তাকে অভয় ও সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর খাদিজা তাকে নিয়ে খ্রিস্টান পন্ডিত ওয়ারাকার নিকট গেলেন। মুহাম্মদ সা. এর কাছ থেকে সবকিছু শুনে ওয়ারাকা খুশি হলেন। ওয়ারাকা বললেন, হেরা গুহায় যিনি এসেছিলেন, তিনি ফেরেশতা জিব্রাইল আ. আর মুহাম্মদ সা. হলেন সর্বশেষ নবী, যার বিবরণ আছে অতীতের ধর্মগ্রন্থ সমূহে।

আল্লাহ এবার সিদ্ধান্ত নিলেন নবী ইব্রাহিম আ. কে পরীক্ষা করতে। এ পরীক্ষা ভালোবাসার পরীক্ষা। ইব্রাহিম আ. কি সত্যিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন নাকি অন্য কিছুকে?

পাঠ ১
কুরাইশদের নিষ্ঠুরতা

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

প্রথম দিকে খুব কম লোকই ইসলাম গ্রহণ করে

ধনী ও ক্ষমতাশালীরা দুনিয়ার লোভ ও স্বার্থের কারণে সব সময় ইসলামের বিরোধী হয়

অবিশ্বাসীদের মাঝেও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক পাওয়া যায়

সত্যকে প্রতিরোধ করতে অমুসলিমরা সীমালংঘন ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়

অমুসলিমরা অনেক শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভীরু হয় ও কাপুরুষিত আচরণ করে

প্রথম দিকের মুসলমানরা ইসলামের জন্য অধিক উৎসর্গিত ছিলেন

প্রকৃত মুসলিমরা সর্বাবস্থায়ই ইসলামের প্রচারে নিজেদের ব্যস্ত রাখে

নবীগণ অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল হয়ে থাকেন

নবীগণ অন্যদের চাইতে অধিক দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান হন

নবী হয়ে মুহাম্মদ সা. মক্কায় ইসলামের প্রচার শুরু করলেন। তিনি লোকদের এক আল্লাহর বন্দেগী করতে এবং মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতে বললেন। মক্কার কুরাইশ নেতারা এতে নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। তারা নবী মুহাম্মদ সা. কে নির্যাতন করতে শুরু করে, এমনকি তাকে হত্যার হুমকি দেয়। নবী মুহাম্মদ সা. এর চাচা আবু তালেব তাকে কুরাইশদের থেকে রক্ষা করেন।

ইসলামের প্রচার থেকে বিরত রাখতে কুরাইশরা তাকে অনেক লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। নবী মুহাম্মদ সা. তাদের প্রস্তাবসমূহ ফিরিয়ে দেন ও ইসলাম প্রচারে অবিচল থাকেন। ফলে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করতে শুরু করে।অতঃপর নবী মুহাম্মদ সা. ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কার অদূরে তায়েফ চলে গেলেন। তায়েফের লোকেরা তার কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানায় ও তাকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে। কিন্তু রহমতের নবী তায়েফের লোকদের অভিশাপ না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন।

অনুশীলনী ২৮

১। নিচের প্রতিটি ঘরে চারটি করে শব্দ রয়েছে। এদের তিনটি পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি সম্পর্কহীন। সম্পর্কহীন শব্দটি বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত কর।

নবী	প্রচার	হালিমা	ইসলাম
ইবাদত	আল্লাহ	এক	মূর্তি
সরদার	মক্কা	সুখী	কুরাইশ

হত্যা	নির্যাতন	বিশ্বাস	হুমকি
চাচা	আবু তালেব	রক্ষা	আমিনা
লোভনীয় প্রস্তাব	কোরাইশ	আনুগত্য	দমন
পাথর	গ্রহণ	অস্বীকার	তায়েফ
ধৈর্যশীল	অভিশাপ	ক্ষমা	নবী

ইসলামের দাওয়াত ও কুরাইশদের প্রতিরোধ
পর্ব ১: কুরাইশদের নানা ধরণের উৎপাত

মুহাম্মদ সা. এখন অন্য এক ব্যক্তি। তিনি এখন আল্লাহর পক্ষ হতে নির্বাচিত নবী। নবীদের কাজ লোকদের আল্লাহর দিকে ডাকা। তাই অতীতের সকল নবী ও রাসূলের মত তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। তিনি লোকদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগী এবং তার আনুগত্য করতে আহ্বান জানালেন। মক্কার খুব কম লোকই তার দাওয়াতে সাড়া দিল এবং তাকে নবী হিসেবে মেনে নিল।

“হে লোক সকল!” তিনি বলতে লাগলেন, “আমি বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী। অতএব এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করো। আর কখনো শয়তানের অনুসরণ করো না। এই দাওয়াত পাওয়ার পরেও যদি মন্দ পথ অনুসরণ করো, তাহলে জেনে রাখো, তোমাদের জন্য কঠিন আজাব অপেক্ষা করছে।”

অধিকাংশ লোক, বিশেষ করে সম্পদশালী কুরাইশরা তার দাওয়াতে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা সত্য বুঝা ও তার অনুসরণের পরিবর্তে উল্টো প্রচার শুরু করলো, “মুহাম্মদ আমাদের ধর্মের বিরোধী। সে আমাদের দেবতাগণকে ‘মিথ্যা খোদা’ বলছে। সে বলছে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বিপথগামী ও জাহান্নামী।” এ অপপ্রচার হিংসার আগুন জ্বালিয়ে তুললো। কুরাইশরা মুহাম্মদ সা. এর উপর নির্যাতন শুরু করল। তারা প্রথমে তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ ও হাসাহাসি করলো। কেউ কেউ তাকে অশালীন ভাষায় গালমন্দ করল। কেউবা তাকে পাগল আখ্যা দিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা তাকে হত্যারও হুমকি দিল। কিন্তু নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি থেমে যাবার পাত্র নন। এসব কিছুর জবাব না দিয়ে তিনি তার দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। তিনি আরো নতুন উদ্যমে সত্যের পক্ষে যুক্তি দিয়ে মিথ্যাকে পরাভূত করতে লাগলেন।

নবী মুহাম্মদ সা. এর চাচা আবু তালেব ছিলেন কুরাইশদের সর্বোচ্চ নেতা। তিনি ব্যক্তিগতভাবে

একজন ভালো লোক। আবু তালেব তার ভাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ সা. কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। যদিও মক্কায় তখন মুহাম্মদ সা. এর অসংখ্য শত্রু ছিল। কিন্তু চাচার প্রভাব এবং ক্ষমতার কারণে কেউ তাকে তেমন কিছু বলার সাহস পেত না। কুরাইশ নেতারা নবী মুহাম্মদ সা. এর বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, কিন্তু আবু তালেবের কারণে কুরাইশদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতো। আবু তালেব তার ভাতিজাকে কুরাইশদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতেন।

কুরাইশরা দেখল, কোনভাবেই মুহাম্মদ সা. কে দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তারা জানত, তিনি একজন সত্যবাদী লোক এবং তার প্রচারিত দাওয়াত যুক্তিযুক্ত। তিনি ভালো কাজের দিকে লোকদের ডাকছেন। কিন্তু তারা এটাও জানত, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের সম্পদে দরিদ্র ও অসহায় লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর কেবল ধর্মভীরু লোকেরাই সেখানে নেতা এবং শাসক হওয়ার সুযোগ পাবে। সম্পদের লোভ ও ক্ষমতার মোহে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাদের স্বার্থপরতা নিঃসন্দেহে খুবই মন্দ ছিল।

এখন তাদের করণীয় কী? তারা ভেবে কোন সমাধান পাচ্ছে না। অবশেষে তারা একটি মন্দ পরিকল্পনা করল। একদা তারা মুহাম্মদ সা. এর কাছে এক লোককে পাঠালো। "আমি তোমার কাছে কোরাইশদের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।" লোকটি মুহাম্মদ সা. কে বলল, "আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি তোমাকে আরবের সবচেয়ে ধনী লোক বানিয়ে দেবো, যদি তুমি ইসলাম প্রচার বন্ধ কর।"

নবী মুহাম্মদ সা. উত্তর দিলেন, "আমি সম্পদের আকাঙ্ক্ষী নই এবং আমার ধনী হওয়ার কোন খায়েশ নেই।" "তবে যদি আমরা আপনাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দেই, তাহলে কেমন হয়?" লোকটি বলল। "না, তোমারা আমাকে রাজা বানিয়ে দিলেও আমি আমার দাওয়াত থেকে কখনো বিরত হবো না।" নবী মুহাম্মদ সা. উত্তর দিলেন। "ঠিক আছে, তাহলে যদি আমরা তোমাকে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দেই, তবে কি তুমি তোমার দাওয়াত পরিত্যাগ করবে না?" "অবশ্যিই না" নবী মুহাম্মদ সা. সাফ জানিয়ে দিলেন। "ঠিক আছে, তুমি যদি দাওয়াত প্রচার বন্ধ না করো, তাহলে আমরা তোমার অনুসারীদেরকে অবশ্যই স্তব্ধ করে দেব।" এ কথা বলেই লোকটি বিদায় নিল।

এ ঘটনার পর মক্কার লোকেরা ইসলাম গ্রহণকারী নতুন মুসলিমদের উপর নির্যাতন শুরু করলো। হাবশী বেলাল ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি ছিলেন উমাইয়া নামক এক ধনী কুরাইশ নেতার ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের কারণে উমাইয়া তাকে অমানষিক নির্যাতন করতে শুরু করলো। তাকে উলঙ্গ করে প্রখর রোদে তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিত। অতঃপর তার বুকের উপর ভারী পাথর রেখে চাবুক দিয়ে পিঠাতো। পাথরের চাপে তার বুকের হাড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হতো। উমাইয়া তাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, জীবন বাঁচাতে হলে ইসলাম ত্যাগ করো। জবাবে বেলাল রা. বলতেন, 'আহাদ' 'আহাদ'- 'আল্লাহ এক' 'আল্লাহ এক'।

এভাবে কুরাইশরা দুর্বল ও অসহায় নতুন মুসলিমদের নানান ভাবে নির্যাতন ও অত্যাচার করতে লাগলো। তাদের অত্যাচারে অনেক দরিদ্র মুসলিম তাদের জীবন হারালেন। তারা সত্যের উপর অটুট থেকে শহীদ হলেন। কিন্তু কোন একজন ব্যক্তিও ইসলাম ত্যাগ করলেন না।

পর্ব ২: তায়েফের কঠিন ও রক্তাক্ত দিন

অনেক চেষ্টার পর মক্কায় হাতে গোনা লোক মুসলমান হয়েছে। তাই নবী মুহাম্মদ সা. যেতে চান নতুন স্থানে নতুন লোকদের কাছে। তদেরকে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে চান। মক্কার সবচেয়ে নিকটবর্তী জনবসতি হলো তায়েফ। নবী মুহাম্মদ সা. তায়েফের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তায়েফে পৌঁছে তিনি লোকদের দাওয়াত দিলেন এই বলে, "হে লোকেরা! এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং মন্দ কাজ পরিহার করো। আমি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নবী। অতএব আমার কথা শোন ও আমার অনুসরণ করো।" একথা শুনেই লোকরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ তাকে একজন পাগল বলল। আবার কেউ কেউ মিথ্যাবাদী বলে ধমক দিতে লাগলো। নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি তায়েফের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে আল্লাহর বাণী প্রচার করলেন। কিন্তু একটি লোকও ইসলাম কবুল করলো না। বরং তায়েফের দুষ্ট লোকেরা তার সাথে খুবই মন্দ আচরণ করলো।

তিনি ভঙ্গ হৃদয় নিয়ে তায়েফ ছেড়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। তখন কিছু গুন্ডা প্রকৃতির লোক তার পিছু নিলো। তারা পিছন থেকে তার উপর পাথর ছুড়ে মারল। তারা তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিল। পাথরের আঘাতে নবী মুহাম্মদ সা. এর শরীর রক্তাক্ত হলো। ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে পথ চলতে চলতে তিনি অনেক বেশি ক্লান্ত। একটি নিরিবিলি স্থানে খেজুর বাগানের ছায়ায় আল্লাহর নবী আশ্রয় নিলেন। তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু তার অন্তরে তায়েফবাসীর প্রতি কোনো তিক্ততা বা রাগের অনুভূতি নেই। তার অন্তরে কেবল ছিল অসহায়ত্বের অনুভূতি।

"হে আল্লাহ!" তিনি দোয়া করতে লাগলেন, "আপনি পরম করুনাময়। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দুর্বলতা দূর করে দিন ও আমাকে শক্তিশালী করুন। কারণ আমার কোন ক্ষমতা নেই কিন্তু আপনার সবই করার ক্ষমতা আছে। আর তায়েফবাসীকে ক্ষমা করে দিন। কারণ তারা বুঝে না। আমি আশা করছি, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে। অতএব তাদেরকে ধ্বংস করবেন না।"

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক / অবিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *নবীরা তাদের সন্তানদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তবে সে ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার চাইতে বড় নয়*
- *সত্য দ্বীনের প্রচার ও প্রসার সর্বদাই চালু রাখতে হবে*
- *প্রথম দিকে কম লোকেই দাওয়াত গ্রহণ করে, কেবল পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীরাই তা করে*
- *নবীরা লোকদের সামনে মুক্তির পথ তুলে ধরেন এবং ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করেন*

- *সম্পদশালী এবং ক্ষমতাসীনরাই প্রথম নবীদের দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে ও বিরোধিতা করে*
- *তারা সম্পদ আর ক্ষমতা হারানোর আশংকা করে, তারা ইনসাফ ও সম অধিকারকে ভয় পায়*
- *সম্পদের প্রতি অতি লোভ ও স্বার্থপরতা অত্যন্ত মারাত্মক দুটি ব্যাধি, যা সত্য গ্রহণে বাধা হয়*
- *অবিশ্বাসীরা নবীদের দাওয়াতে কোন ত্রুটি পায় না, তাই নির্যাতন ও জুলুমের পথ বেছে নেয়।*
- *প্রত্যেক সমাজে অবিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু ভালো ও কোমল হৃদয়ের লোক পাওয়া যায়*
- *সত্যকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সর্বদাই লোভনীয় প্রস্তাব দেয়া হয়*
- *সত্যের প্রচারকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য অবিশ্বাসীরা অনেক সময় নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করে*
- *অবিশ্বাসীরা ভীরু ও কাপুরুষ হয়, অধিকাংশ সময়েই তারা দুর্বল ও অসহায়দের নির্যাতন করে*
- *ঈমানদারগণ সত্যপ্রিয় ও ত্যাগী হন, ঈমান ও ইসলাম রক্ষায় তারা সবই ত্যাগ করতে পারেন*
- *মুসলমানকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল হতে হবে এবং ইসলাম প্রচার চালাতে হবে*
- *লোকদের একটি অংশ দাওয়াত অস্বীকার করলে, অন্যদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে*
- *নবীরা সর্বদা মানুষের কল্যাণ কামনা করেন কিন্তু অবিশ্বাসীরা তাদের ক্ষতি করতে চায়*
- *নবীরা ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল হয়ে থাকেন কিন্তু অবিশ্বাসীরা সর্বদা অধৈর্য এবং নিষ্ঠুর হয়*
- *নবীদের হৃদয় প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ও তিক্ততা মুক্ত হয়, তারা হন মানব দরদী*
- *নবীরা সর্বদা অন্যদের কল্যাণকামী হন আর নিজেদের ব্যাপারে তারা খুব কমই চিন্তা করেন*
- *নবীরা বিনয়ী ও নিরহংকারী হয়ে থাকেন, তারা নিজেদের দুর্বলতার জন্য আল্লাহর সাহায্য চান*

অনুশীলনী ২৯

১। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পূর্ণ কর ।

মক্কার লোকেরা ইসলাম গ্রহণকারী নতুন মুসলিমদের উপর ------------ শুরু করলো । হাবশী ----------- ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি ছিলেন ------------ নামক এক ধনী কুরাইশ নেতার -----------। ইসলাম গ্রহণের কারণে ------------- তাকে অমানষিক নির্যাতন করতে শুরু করলো। তাকে উলঙ্গ করে প্রখর রোদে তপ্ত ---------উপর শুইয়ে দিত। অতঃপর তার বুকের উপর ভারী -------- রেখে চাবুক দিয়ে পিঠাতো। পাথরের চাপে তার বুকের --------- ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হতো। উমাইয়া তাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, জীবন বাঁচাতে হলে ---------- ত্যাগ করো। জবাবে বেলাল রা. বলতেন, 'আহাদ' 'আহাদ'- '-----------এক' '------------ এক'।

"হে আল্লাহ!" তিনি দোয়া করতে লাগলেন, "আপনি পরম করুনাময়। অতএব আমাকে ------- করুন, আমার দুর্বলতা দূর করে দিন ও আমাকে ----------- করুন। কারণ আমার কোন ক্ষমতা নেই কিন্তু আপনার সবই করার -------- আছে। আর তায়েফবাসীকে --------- করে দিন। কারণ তারা বুঝে না। আমি আশা করছি, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে। অতএব তাদেরকে -------- করবেন না।"

পাঠ ২
মেরাজ

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

সবাই দূরে ঠেলে দিলেও আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের একা ছেড়ে দেননা

মিরাজ ছিল নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি আল্লাহর মহান ভালোবাসার একটি বড় প্রমান

মহাবিশ্বের অসংখ্য জগতের এক ক্ষুদ্র জগৎ হলো আমাদের বসবাসের এ পৃথিবী

মহাবিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির বিশালতা ও রহস্য আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির বাহিরে

আল্লাহ সব কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ট ও মহান এবং বিশাল সৃষ্টি জগৎ তার নিয়ন্ত্রণাধীন

আল্লাহর নৈকট্য, আনুগত্য ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা শান্তি ও আনন্দ দেয়

সময় ও দূরত্ব আল্লাহর ইচ্ছার অধীন ও তিনি যেভাবে চান তা নিয়ন্ত্রণ করেন

আল্লাহর অবাধ্য লোকেরা সব সময় সংকীর্ণ চিন্তা ও অদূরদর্শিতার প্রমান দেয়

নবী মুহাম্মদ সা. কে একবার আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার জন্য জান্নাত থেকে পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া সদৃশ বাহন 'বুরাক' নিয়ে আসা হলো। ফেরেশতা জিব্রাইল আ. তাকে বুরাকে চড়িয়ে সপ্ত আকাশের উপরে নিয়ে গেলেন।

প্রথমে মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে যাওয়া হল জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদে আকসায়। অতঃপর সাত আসমান পাড়ি দিয়ে তাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। নবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর সীমাহীন মহিমা ও তার অসাধারণ কুদরত দেখতে পান। নবী মুহাম্মদ সা. সেখানে অনাবিল প্রশান্তি ও অকল্পনীয় আনন্দ উপভোগ করেন।

অতঃপর ফেরেশতা জিব্রিল আ. তাকে নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এসব কিছুই ঘটেছিল চোখের একটি পলকে, অতি অল্প সময়ে। মক্কার অবিশ্বাসীরা এই বিস্ময়কর ঘটনা বিশ্বাস করতে পারেনি। নবী মুহাম্মদ সা. এর সপ্ত আকাশের এই ভ্রমণকে বলা হয় মেরাজ।

অনুশীলনী ৩০

১। নিচের ঘরে রক্ষিত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

আল্লাহর	আসমান	আনন্দ	আকসায়	পর্দার	বুরাক	চোখের	কুদরত	মেরাজ

ক. নবী মুহাম্মদ সা. কে একবার ---------- সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

খ. তার জন্য জান্নাত থেকে পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া সদৃশ বাহন '----------' নিয়ে আসা হলো।

গ. প্রথমে মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে যাওয়া হল জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদে ----------।

ঘ. অতঃপর সাত --------- পাড়ি দিয়ে তাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঙ. নবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও ---------- আড়াল থেকে কথা বলেন।

চ. সেখানে তিনি আল্লাহর সীমাহীন মহিমা ও তার অসাধারণ ---------- দেখতে পান।

ছ. নবী মুহাম্মদ সা. সেখানে অনাবিল প্রশান্তি ও অকল্পনীয় --------- উপভোগ করেন।

জ. এসব কিছুই ঘটেছিল ---------একটি পলকে, অতি অল্প সময়ে।

ঝ. নবী মুহাম্মদ সা. এর সপ্ত আকাশের এই ভ্রমণকে বলা হয় -----------।

মেরাজের ঘটনা

অনেক চেষ্টার পর লোকেরা কাঙ্খিত হারে ইসলাম গ্রহণ করছে না। এদিকে তায়েফের লোকদের আচরণ ছিল আরো বেশি দুঃখ জনক। নবী মুহাম্মদ সা. ভাবছেন, লোকেরা কেন সত্য গ্রহণ করছে না? তাহলে কি আমার দাওয়াতে কোন দুর্বলতা আছে? আমিতো লোকদের কেবল এক আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহ্বান করছি। আহ্বান করছি সত্যের পথে, জান্নাতের পথে। আমি তাদের সতর্ক করছি, তাদের মন্দ পরিনাম সম্পর্কে। তাদের আহ্বান জানাচ্ছি, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করতে। আহ্বান জানাচ্ছি জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচতে। কিন্তু লোকেরা কেন সত্যের পথে আসছে না?

নবী মুহাম্মদ সা. ভাবছেন, আমিতো তাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনি। আমি চাইনি কোন ধন সম্পদ, কোন রাজত্ব কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তি। আমি নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহর জন্য দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তবুও কেন লোকেরা সারা দিচ্ছে না? কেন এত অল্প লোক ইসলাম গ্রহণ করছে?

নবী মুহাম্মদ সা. এতে দুঃখ পেলেন এবং নিজেকে একাকী অনুভব করলেন। নবী মুহাম্মদ সা. অবশ্য জানতেন, যদি বিশ্বের সকল মানুষ ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবুও একজন আছেন যিনি কখনো তাকে ফেলে যাবেন না। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি সব কিছু দেখেন এবং সব কিছু শুনেন। তিনি কখনো তাকে একা ফেলে রাখবেন না। সময়টি নিঃসন্দেহে নবী মুহাম্মদ সা. এর জন্য ছিল খুবই কঠিন ও কষ্টকর।

সেই কঠিন ও দুঃখ জনক মুহূর্তে একটি বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল। এক রাতে নবী মুহাম্মদ সা. ঘুমিয়ে আছেন। ফেরেশতা জিব্রিল আ. তার কাছে এসে তাকে জাগিয়ে তুললেন। “চলুন হে নবী মুহাম্মদ! আপনার রব, আল্লাহ আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।”

নবী মুহাম্মদ সা. দরজা খুলে বাহিরে তাকালেন। তিনি একটি অতি বিস্ময়কর প্রাণী দেখতে পেলেন। ঘোড়া সদৃশ বিশাল পাকা বিশিষ্ট একটি অতি উজ্জ্বল প্রাণী। এমন প্রাণী অতীতে কখনো তিনি দেখেননি। জান্নাতি এ প্রাণীটির নাম হলো বুরাক।

জিব্রিল আ. বললেন, আপনি বুরাকে আহরণ করুন এবং আমাদের সাথে বেহেশতের পথে চলুন। নবী মুহাম্মদ সা. বুরাকে আরোহন করলেন। জান্নাতি বুরাক পাকা ঝাপটে উড়ে চলো উর্ধে গগনে, তারকা খচিত রাতের আকাশে। বুরাক ছুটে চলল বিদ্যুৎবেগে। নবী মুহাম্মদ সা. নিচে তাকিয়ে ঘরবাড়ি দেখতে পান। এসব ক্রমশ ছোট থেকে ছোট হচ্ছে। তিনি দেখতে পান খেজুর বাগান এবং একের পর আরেক মরুদ্যান। পূর্ণ চাঁদের আলোতে মরুভূমিকে মনে হচ্ছে মহাসমুদ্রের মত। কী বিস্ময়কর দৃশ্য!

নবী মুহাম্মদ সা. প্রথমে জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদে আকসায় গিয়ে পৌঁছলেন। আর সেখান থেকে বুরাক তাকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। অতঃপর নীল আকাশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তারকা গুলোকে অতিক্রম করে বুরাক ছুটে চলল উপর থেকে উপরে। নবী মুহাম্মদ সা. কে প্রথম আকাশের দরজায় নিয়ে যাওয়া হল। তিনি সেখানে অগণিত অসংখ্য ফেরেশতা দেখতে পেলেন। অতঃপর এক এক করে তিনি সকল আকাশ পাড়ি দিতে লাগলেন। বিস্ময়কর ও অভিনব দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে অবশেষে সপ্ত আকাশে উপনীত হলেন।

অতঃপর নবী মুহাম্মদ সা. এক এক করে রং বেরঙের অসংখ্য পর্দা পাড়ি দিতে লাগলেন। জান্নাতি আলো ও মণি মুক্তা খচিত ছিল এসব পর্দা। ছিল হিরা জহরত দিয়ে তৈরি স্বর্ণালী রঙের পর্দাও। এসব পর্দার আলো ও কাঁরুকাজ মানব কল্পনার উর্ধ্বে। সবকিছু পাড়ি দিয়ে তিনি সর্বশেষ সীমান্তে গিয়ে উপনীত হলেন। অবশেষে নবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহ তাআলার কুদরতি আলোর বিস্ময়কর পর্দাটার খবই কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।

নবী মুহাম্মদ সা. সেখানে অসাধারণ শান্তি ও অকল্পনীয় আনন্দ উপভোগ করলেন। সেখানে কোন অন্ধকার এবং দুঃখের ছোঁয়া নেই। নেই কোন একাকীত্ব ও বেদনার অনুভূতি। সেখানে নেই কোন সময়ের হিসাব। সেখানে কেবল একজনই আছেন। তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ও সবচেয়ে মহান আল্লাহ। নবী মুহাম্মদ সা. সেখানে আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শন অবলোকন করলেন। তিনি অনুভব করলেন একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন রক্ষাকারী যিনি সবচেয়ে বেশি নিকটে। আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি দয়ালু এবং সবচেয়ে বড় দানশীল। নবী মুহাম্মদ সা. অনুভব করলেন পরম প্রশান্তি ও অনন্ত সান্ত্বনা। পর্দার আড়াল হতে তিনি কথা বললেন আল্লাহর সাথে।

অতঃপর নবী মুহাম্মদ সা. আবার পৃথিবীর পথ ধরলেন। সপ্ত আকাশ এক এক করে পাড়ি দিয়ে চলে এলেন প্রথম আকাশের নিচে। মেঘমালার পর্দা পাড়ি দিয়ে এলেন পৃথিবীতে। নেমে এলেন জেরুজালেমে। সেখান থেকে আবার মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল। মরুময় প্রান্তর, খেজুর

বাগান ও উঁচুনিচু পাহাড় পর্বত দেখে দেখে চলছেন মক্কার পানে। পথে তিনি কিছু ব্যবসায়ী কাফেলার লম্বা লাইন দেখে দেখে চলে এলেন মক্কায় কাবার আঙ্গিনায়। কিন্তু কী আশ্চর্য? এখনো তার বিছানা আগের মতই গরম রয়েছে। তার ব্যবহৃত পাত্রের পানি এখনো গড়িয়ে পড়ছে।

নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবনে ঘটে যাওয়া এই বিস্ময়কর পরিভ্রমণকে বলা হয় 'মেরাজ'। জান্নাতি এই পরিভ্রমন এক মুহূর্তের চেয়ে কম সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান। সকল প্রশংসা তার, যিনি তার প্রিয় নবীকে রাত্রি ভ্রমণ করিয়েছিলেন।

সকাল বেলা আল্লাহর নবী কোরাইশদের সামনে রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দিলেন । তা শুনে তারা অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লো। অতঃপর যখন নবীজি তাদের কাছে জেরুজালেমের বর্ণনা তুলে ধরলেন এবং রাস্তায় পাওয়া বাণিজ্যিক কাফেলার হুবহু বর্ণনা দিলেন, তখন তারা নীরব হয়ে গেল। তারা এই ভেবে অবাক হলো, লোকটি এত সব জানতে পারলো কিভাবে? সে তো কখনো জেরুজালেম যাইনি? কিভাবেই সে কোরাইশদের কাফেলার বর্ণনা উপস্থাপন করল? তারা চিন্তা করল, সম্ভবত এটি একটি জাদু বা এজাতীয় কিছু। কিন্তু না, আসল সত্য হলো, এ সবই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও তার কুদরতের বিস্ময়কর প্রকাশ। আল্লাহ তার নবীকে দিয়ে এমন অসম্ভবকে করেছিলেন সম্ভব। আল্লাহ একে পেশ করেছিলেন তার নবুয়তের প্রমান হিসেবে।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক / অবিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *নবীদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল স্রষ্টার সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয়া*
- *নবীগণ দাওয়াতের বিনিময়ে মানুষের কাছে না চান কোন অর্থ, না কোন প্রশংসা ও ধন্যবাদ*
- *নবীরা যা কিছু করেন তা কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই*
- *জগতের সবচেয়ে ভালো মানুষরাও অন্যদের দ্বারা উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হন*
- *দুনিয়ার সকল মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিলেও আল্লাহ তার বান্দাদের সাথেই থাকেন*
- *বান্দার যা কিছু প্রয়োজন তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট*
- *মেরাজ ছিল নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি আল্লাহপাক প্রদত্ত একটি অসাধারণ মোজেজা*
- *মুহাম্মদ সা. ছাড়া অন্য কোন নবীর পক্ষে এ ধরনের বাস্তব মেরাজ লাভ সম্ভব হয়নি*
- *মেরাজ ছিল নবী মুহাম্মদ সা. প্রতি আল্লাহ পাকের অসাধারণ ভালোবাসার একটি নিদর্শন*
- *আল্লাহ তার সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে সরাসরি তার কাছে ডেকে নিয়েছিলে ও কথা বলেছিলেন*
- *বুরাক হল একটি জান্নাতি পশু যা আমাদের কল্পনা এবং বোধগম্যতার বাহিরে*
- *মসজিদে আকসা হলো কাবার পরে দুনিয়ার বুকে নির্মিত সবচেয়ে পবিত্র মসজিদ*
- *আমাদের মহাবিশ্বের ন্যায় অসংখ্য অগণিত জগৎ আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন*
- *ফেরেশতাদের জগত আমাদের ধারণা ও কল্পনার বাহিরে*
- *জান্নাতের সৌন্দর্য ও বিশালতা অকল্পনীয় ও অসাধারণ*
- *আল্লাহ এবং সৃষ্টির মধ্যখানে রয়েছে অসংখ্য অগণিত পর্দা*
- *কারণ আল্লাহ এতই ক্ষমতা সম্পন্ন যে, সৃষ্টি সরাসরি তা দেখে সহ্য করতে পারবে না*
- *যদি এসব পর্দা উঠানো হয় তাহলে আল্লাহর তাজাল্লিতে সকল সৃষ্টি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে*

- *আল্লাহর সৌন্দর্য এবং আলো হচ্ছে সবকিছুর চাইতে ঊর্ধ্বে যা আমাদের কল্পনার বাহিরে*
- *নবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহ পাকের নূর দেখেছিলেন, সরাসরি আল্লাহকে দেখেননি*
- *যে ব্যক্তি আল্লাহর যত কাছাকাছি পৌঁছবে সে উভয় জগতে তত বেশি শান্তি এবং সুখ অনুভব*
- *যারা আল্লাহ থেকে যত দূরে তারা পাপ এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় ততই নিমজ্জিত*
- *আল্লাহ থেকে যত দূরে থাকা লোকেরা প্রকৃত শান্তি ও সুখ অনুভব করতে পারবে না*
- *আল্লাহই বান্দার একমাত্র রক্ষাকারী কারণ তিনিই বান্দার সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি*
- *আল্লাহ সময় এবং স্থানের ঊর্ধ্বে তিনি হচ্ছেন সকল কিছুর স্রষ্টা এমনকি সময় ও স্থানেরও*
- *আল্লাহর সাথে কোন সময় এবং স্থানের সম্পর্ক নেই, তার কাছে সবই বর্তমান ও সম্মুখে*
- *আমরা কেবল আল্লাহর গুণাবলি (অত্যন্ত দয়ালু,অত্যন্ত দানশীল, সর্বোত্তম স্রষ্টা)নিয়ে চিন্তা করতে পারি তিনি*
- *মিরাজের মতো বিশাল ঘটনা চোখের পলকেই সংগঠিত হয়েছিল*
- *আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং তিনি যা চান তাই মুহূর্তের মধ্যে করতে পারেন*
- *অবিশ্বাসীরা সীমিত চিন্তার অধিকারী তাই অদেখা জগত তারা বিশ্বাস করতেও পারে না*
- *অবিশ্বাসীরা এ ঘটনাকে জাদু বা গণকের কাজ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তারা বুঝতে সক্ষম নয়, কারন আল্লাহ সম্পর্কে তারা মূলত অজ্ঞ*

অনুশীলনী ৩১

১। তোমার পিত মাতা / অভিভাবকের সাহায্য নিয়ে নিচের কোরানের আয়াতটির বাংলা অনুবাদ লিখো।

(সূরা আল ইসরা, আয়াত ১)

পাঠ ৩
মদিনায় হিজরত

মদিনায় বেশকিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করল এবং তারা মুহাম্মদ সা. কে মদিনায় চলে আসতে বললো। কুরাইশরা যখন বুঝলো, মুসলমানরা ধীরে ধীরে মদিনায় চলে যাচ্ছে, তখন তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলো। তাই তারা নবী মুহাম্মদ সা. কে হত্যার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সা. কে কুরাইশদের দুষ্ট পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন এবং মক্কা ত্যাগ করতে বললেন। নবী নবী মুহাম্মদ সা. তার প্রিয় সঙ্গী আবু বকর রা. কে সাথে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কা ত্যাগ করলেন। কুরাইশরা যখন বুঝলো, মুহাম্মদ সা. মক্কা ত্যাগ করেছেন, তারা তখন তার খুঁজে চতুর্দিকে সৈন্য পাঠালো। নবী মুহাম্মদ সা. এবং তার সঙ্গী আবু বকর রা. 'সাওর' নামক গুহায় আত্মগোপন করলেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় ঠিক তখনই গুহার প্রবেশ পথে মাকড়সা জাল বুনলো এবং কবুতর বাসা বেঁধে ডিম দিল। কুরাইশ সৈন্যদল গুহার মুখে মাকড়সার জাল ও কবুতরের ডিম দেখে ভাবল, নিঃসন্দেহে ভিতরে কেউ নেই। অতঃপর নবী মুহাম্মদ সা. ও আবু বকর রা. ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। তাদের আগমনে ইয়াসরিবের অধিবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো। নবীর আগমনে তারা তাদের শহরের নামকরণ করল 'মদিনাতুন নবী'(নবীর শহর)' বা সংক্ষেপে 'মদিনা'। নবী মুহাম্মদ সা. এর মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাওয়ার এ ঘটনাকে বলা হয় হিজরাত। বিশ্বের সকল মুসলিম এই দিনটিকে হিজরী ক্যালেন্ডারের সূচনা হিসেবে গণ্য করে।

অনুশীলনী ৩২

১। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর।

সত্য মিথ্যা

☐ ☐ ক. ইয়াসরিব বাসীরা নবী মুহাম্মদ সা. কে তাদের শহরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেছিল।

☐ ☐ খ. কুরাইশরা নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবন রক্ষার জন্য পরিকল্পনা করেছিল।

☐ ☐ গ. নবী মুহাম্মদ সা. আবু বকর রা. কে সাথে নিয়ে গোপনে মক্কার ত্যাগ করলেন।

☐ ☐ ঘ. নবী মুহাম্মদ সা. ও আবু বকর রা. 'হেরা' নামক গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন।

☐ ☐ ঙ. তাদের রক্ষা করতে আল্লাহ গুহার প্রবেশ পথে বিশাল একটি সিংহ বসিয়ে দিয়েছিলেন।

☐ ☐ চ. কুরাইশরা নবী মুহাম্মদ সা. ও আবু বকর রা. কে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছিল।

☐ ☐ ছ. নবী মুহাম্মদ সা. এর আগমনে ইয়াসরিব বাসিরা আনন্দিত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

☐ ☐ জ. নবী মুহাম্মদ সা. এর মক্কা থেকে মদিনা এভাবে চলে যাওয়াকে মেরাজ বলা হয়।

মক্কা থেকে ইয়াসরিবে হিজরত
পর্ব ১: কুরাইশদের জগন্য ষড়যন্ত্র

মক্কায় অবস্থান মুসলমানদের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছিল। কুরাইশ সরদার ও নবীজির চাচা আবু তালেব এর মৃত্যুতে কুরাইশরা তাদের অত্যাচার বাড়িয়ে দিল। মক্কার মুসলমানরা এখন মহা বিপদের সম্মুখীন। ঠিক সেই সময়ে ইয়াসরিবে বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করল। তারা নবী মুহাম্মদ সা. কে ইয়াসরিবে চলে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানালো। তাদের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নবী মুহাম্মদ সা. ইয়াসরিবে স্থায়ীভাবে চলে যেতে একমত হলেন। তার অনুমতি পেয়ে বেশ কিছু মুসলিম ইতোমধ্যে ইয়াসরিবে চলে গিয়েছেন। ধীরে ধীরে প্রায় সকল মুসলিম মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিবে চলে গেলেও নবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। মক্কায় তার সাথে রয়ে গেছেন আরও দুইজন: আবু বকর রা. ও আলী রা.।

কুরাইশরা দেখলো তাদের সব সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাই দুষ্ট কুরাইশ নেতারা গোপন বৈঠকে মিলিত হলো। উদ্দেশ্য, মুহাম্মদ সা. কে হত্যা ও ইসলামের নাম নিশানা মিটিয়ে দেয়ার পথ বের করা। অনেক আলাপ আলোচনার পর দুষ্ট আবু জাহেল প্রস্তাব দিল, “প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন যুবক বাছাই করে তাদের হাতে একটি খোলা তরবারি দেয়া হবে। তারা সকলে এক সাথে রাতের অন্ধকারে মুহাম্মদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখবে এবং সকালে সে যখন ঘর থেকে বের হয়ে আসবে তখন তারা একসাথে তার উপর আক্রমণ করবে। এটাই হচ্ছে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান ।” কুরাইশ নেতারা আবু জেহেলের এই প্রস্তাবে ঐক্যমত হল।

তারা ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করল নবীর জীবন এবং ইসলামকে শেষ করে দিতে। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। আল্লাহও তার পরিকল্পনার কথা নবীকে অবহিত করলেন। গভীর রাতে জিবরীল আ. নবী মুহাম্মদ সা. কে জানিয়ে দিলেন, তিনি যেন রাতেই মক্কা ত্যাগ করেন। নবী মুহাম্মদ সা. আগে থেকেই আবু বকর রা. কে ইয়াসরিবে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন। নবী মুহাম্মদ সা. বুঝতে পেরেছিলেন তাকে হত্যা করার জন্য তারা চোখে চোখে রাখছে। তাই তিনি তার চাচাতো ভাই আলীকে তার বিছানায় শুইয়ে তার নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। যাতে কুরাইশরা বাহির থেকে তার চাদর দেখে বুঝতে পারে, তিনি শুয়ে আছেন। নবী মুহাম্মদ সা. এটাও জানতেন যে, আলী কুরাইশদের সাবেক সরদার আবু তালেবের ছেলে হওয়ায় তার উপর হাত তুলতে তারা সাহস পাবে না।

কুরাইশ যুবকদের সম্মিলিত সৈন্যদল রাতের আঁধারেই নবী মুহাম্মদ সা. এর ঘরকে ঘেরাও করে রাখল। তাদের একজন বাহির থেকে ছিদ্র দিয়ে দেখলো কে একজন ঘুমিয়ে আছেন। এ সুযোগে নবী মুহাম্মদ সা. চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কোরাইশ যুবকরা তা মোটেই বুঝতে পারল না।

কুরাইশ যুবকদের সৈন্যদল সারারাত নীরবে নিস্তব্ধে অপেক্ষা করছিল। ভোর হলে যখন দরজা খোলা হবে তখন তারা এক যুগে নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। সকালে দরজা খোলা হলে তারা ঘরের ভিতর আলীকে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল। তারা বুঝলো, যার জন্য তারা সারা রাত্রি অপেক্ষা করেছিল, তিনি তাদের নাগালের বাহিরে। কুরাইশ নেতারা দ্রুত আবারো শলা পরামর্শ করল। আবু জেহেল ঘোষণা দিল, “যে ব্যক্তি মুহাম্মদ কে ধরে জীবিত কিংবা মৃত আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবে তাকে আমরা একশত উট পুরস্কার দেব।”

পর্ব ২: আল্লাহর পরিকল্পনা সফল হলো

পুরস্কারের আশায় শত শত তরুণ যুবক খোলা তরবারি নিয়ে চতুর্দিকে ছুটে চলল। লক্ষ্য একটাই মুহাম্মদ সা. কে খুঁজে বের করা। তারা প্রতিটি অলিতে গলিতে, পাহাড়-পর্বতে ও গোহায় তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। ওদিকে নবী মুহাম্মদ সা. তার সঙ্গী আবু বকর রা. কে সাথে নিয়ে দুটি দ্রুতগামী উঠে চড়লেন। তারা সরাসরি ইয়াসরিবের দিকে যাত্রা শুরু না করে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে গেলেন। এটা ছিল নবী মুহাম্মদ সা. এর দূরদর্শিতার আরো একটি প্রমাণ । কুরাইশদেরকে এভাবে তিনি গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে দিলেন।

নবী মুহাম্মদ সা. ও আবু বকর রা. মক্কার অদূরে ‘সাওর’ নামক একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। চতুর্দিকে খুঁজা খুঁজি করে না পেয়ে কুরাইশদের একদল সৈন্য ‘সাওর’ গুহা প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। তারা এখন গুহার প্রায় প্রবেশ পথের কাছাকাছি। নবী মুহাম্মদ সা. এতে মোটেই ভীত নন। কারণ তিনি জানেন, আল্লাহ তার সাথে আছেন এবং তিনি তাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন।

“দেখো, একটি গুহা। সম্ভবত তারা ওই গুহার ভিতরে লুকিয়ে আছে।” গুহার বাহির থেকে একটি ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল। “এমন একটি গোপন স্থানে ওরা লুকিয়ে থাকতে পারে।” আরো একজন সৈন্য বলল।

“এমন হালকা কথা বলোনা। এ ধরনের একটি গুহায় কেউ দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে পারে না” গুহার বাহির থেকে এ ধরনের আরেকটি আওয়াজ এলো। “দেখো গুহার প্রবেশপথে মাকড়সার জাল আর সেখানে একটি কবুতরের বাসায় ডিমও দেখা যাচ্ছে।”

এ কঠিন অবস্থায় আবু বকর রা. বলছিলেন, হে আল্লাহার রাসুল সা.! কুরাইশরা যদি এখন আমাদেরকে দেখতে পায় তাহলে কী হবে? আমি আমার জীবন নিয়ে শংকিত নই। আমি শংকিত আপনার জীবন এবং ইসলাম নিয়ে। “হে আবু বকর! আমরা দুইজন মাত্র নই। আমাদের সাথে আছেন আরো একজন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ।” নবী মুহাম্মদ সা. শান্তভাবে জবাব দিলেন। অবশেষে ভিতরে কেউ নেই ভেবে কুরাইশরা গুহার ভিতরে না ঢুকেই স্থান ত্যাগ করল।

কুরাইশদের দুষ্ট পরিকল্পনা আল্লাহর সাহায্যের কাছে পরাজিত হলো।

পর্ব ৩: রণবীর সুরাকা ও তার ঘোড়া

এরপর তারা উভয়ে গুহা থেকে বের হয়ে ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। যাত্রাপথে সুরাকা বিন মালেক নামে এক সৈন্য তাদেরকে দেখতে পায়। সুরাকা তাদের পিছন ধাওয়া করল। কিন্তু যখনই সে তাদের কাছাকাছি পৌঁছতে চাইল তার ঘোড়া মাটিতে লুটে পড়লো। সুরাকা তার ঘোড়াকে তুলে আবারো তাদের পিছনে ছুটলো কিন্তু এবারও ঘোড়ার সামনের পা মাটিতে ঢুকে গেলো। ফলে সুরাকা ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লো। সে যতবারই তাদেরকে ধরতে চাচ্ছিল, ততবারই একই ঘটনা ঘটতে থাকলো। এত সত্বেও সুরাকা তাদের পিছন ছাড়ছিল না। একশত উট পুরস্কার পাওয়ার আশায় সে মরিয়া হয়ে উঠছিল। সে আরো একবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের কাছাকাছি পৌঁছার চেষ্টা করল। আবু বকর এবারও নবীর জীবন নিয়ে শংকিত হয়ে পড়লেন। "লোকটি হয়তো এবার আমাদেরকে ধরে ফেলবে, হে আল্লাহর রাসূল সা.!" আবু বকর রা. বললেন।

নবী মুহাম্মদ সা. তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলি নাই, হে আবু বকর! আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর।" নবী মুহাম্মদ সা. তখন কোরআন থেকে তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন।

সুরাকা এখন তাদের খুবই কাছাকাছি। শুধু হাত বাড়ালেই তাদেরকে ধরে ফেলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আবারও সুরাকার ঘোড়ার পা মাটিতে ঢুকে গেল। ফলে সে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবার সে প্রচণ্ড আঘাতও পেল। সে অনুভব করল, যেন এ আঘাতে তার সকল হার ভেঙ্গে যাচ্ছে। সুরাকা এবার ভিন্নভাবে চিন্তা করতে লাগল। সে ভাবতে লাগলো, কেউ কি মুহাম্মদকে আমার থেকে রক্ষা করছে। সে নিজের থেকেই বলছিল "নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে আমার আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে।"

সুরাকা এবার আস্তে আস্তে পায়ে হেটে নবী মুহাম্মদ সা. এর কাছে এসে হাটু গেড়ে বসে পড়ল। "হে মুহাম্মদ দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো।" সুরাকা উচ্চস্বরে আওয়াজ দিল। আল্লাহর রাসূল সা. সুরকার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। আহ কি চমৎকার ছিল তার মুচকি হাসি। "সুরকা তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।" নবী মুহাম্মদ সা. মৃদু স্বরে বললেন। আর এভাবেই নবী মুহাম্মদ সা. তার দয়া ও করুণা দ্বারা তার শত্রুদেরও মন জয় করতে পেরেছিলেন।

"দয়া করে আপনার জন্য আমাকে কিছু করতে দিন, হে মুহাম্মদ সা.! এই যাত্রাপথে আপনি যা চান আমি আপনার জন্য তাই করব।" সুরকার কণ্ঠে বিনয়ের আকুতি। "আমাদের এই যাত্রার কথা তুমি কাউকে বলবে না। তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনা।" নবী জবাব দিলেন। যারা তার ক্ষতি চেয়েছিল এমন কারো জন্য তিনি আল্লাহর কাছ থেকে কোন শাস্তি চাননি। তিনি ছিলেন দয়া ও ক্ষমার এক উত্তম উদাহরণ।

দেরি না করেই সুরাকা মক্কার পথ ধরলো। সে পথে যাকেই পেতো তাকে বলতো, তোমরা আর ওদিকে যাবে না। আমি ওদিক দেখে এসেছি। তোমরা উল্টোদিকে তাকে খুঁজতে থাকো। নবীর প্রাণের শত্রু সুরাকা এখন হয়ে গেলেন ইসলামের কল্যাণকামী। নবী মুহাম্মদ সা. ও আবু বকর রা. ইয়াসরিবে পথ ধরে ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। দীর্ঘ সাত দিনের সফর শেষে তারা বরকতময় নগরী ইয়াসরিবে এসে পৌঁছলেন। নবী মুহাম্মদ সা. এর আগমনে ইয়াসরিব বাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত। শিশুরা রাস্তায় রাস্তায় নবীর প্রশংসায় গীত গেয়ে বেড়াচ্ছে। ইয়াসরিব বাসীরা আল্লাহর নবীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো।

সেই দিন থেকে ইয়াসরিব নগরী তার নাম পরিবর্তন করে 'মদিনাতুন নবী' হয়ে গেল যার অর্থ হল 'নবীর শহর'। আর সংক্ষেপে পরিচিত হলো 'মদিনা' হিসেবে।

ইসলাম রক্ষার স্বার্থে মহানবী সা. ও সাহাবীদের মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাওয়ার এ ঘটনাকে বলা হয় হিজরাত। ইসলামের ইতিহাসের এই ঘটনাটি মুসলমানদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য, হিজরতের দিনকে প্রথম দিন ধরে নতুন একটি সন গণনা শুরু হয়, যা হিজরি সন নামে পরিচিত।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক / অবিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *অবিশ্বাসীরা ইসলামকে পুরোপুরি ধ্বংস না করা পর্যন্ত স্বস্থির অনুভব করে না*
- *তাই মুসলমানকে সর্বদাই নিজেদের রক্ষার জন্য তৎপর থাকতে হয়*
- *অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন থেকে ততক্ষন বিরত থাকে, যখন শক্তিশালী কেউ ইসলামের পক্ষে দাঁড়ায়*
- *কিন্তু সেই বাঁধা দূর হয়ে গেলেই, তারা মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য তৎপর হয়*
- *অবিশ্বাসীরা শয়তানের অনুসারী এবং শয়তান তার হিংসা, অহংকারের কারণেই মুসলমানদের ধ্বংস করতে চায়*
- *যখন সাহায্য পাওয়ার সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় তখনও আল্লাহ তার বান্দার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন*
- *নবী মুহাম্মদ সা. কোন কিছুই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া করতেন না*
- *অবিশ্বাসীরা ভীরু ও কাপুরুষ, তারা কেবল দুর্বল এবং অসহায় লোকদের উপর আক্রমণ করে*
- *কাফেররা দুষ্ট পরিকল্পনা ও সড়যন্ত্র করে কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা সব কিছুর চাইতে উত্তম*
- *আল্লাহ যে পরিকল্পনা করেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়, কেউ তা ঠেকাতে পারে না*
- *ধোকা ইসলামে অনুমোদিত নয়, তবে শত্রুর সাথে যুদ্ধ অবস্থায় বা জীবননাশের আশঙ্কা থাকলে ইসলাম তার অনুমতি দেয়*
- *অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে জীবন নাশের প্রবল আশংকা থাকলে ঈমান ও জীবন রক্ষার্থে আত্মগোপন করা যাবে*
- *সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ এমন একটি অপরাধ যা অবিশ্বাসীদেরকে নবী হত্যায় পর্যন্ত প্রলুব্ধ করে*
- *আল্লাহ সর্বদা তার বিশ্বাসী বান্দাদেরকে রক্ষা করেন, বিশেষ করে কঠিন সময়ে*
- *সবচেয়ে বড় শত্রুর মোকাবেলাও আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অতি ক্ষুদ্র জিনিস দ্বারা সাহায্য করতে পারেন*
- *আল্লাহ কাউকে রক্ষা করতে চাইলে দুনিয়ার কোন শক্তি তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না*
- *সকল সৃষ্টি আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের সহযোগিতা করে, এমনকি পোকামাকড় ও পশু পাখি পর্যন্ত*
- *শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষায় সালাত এবং কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষমতা অসাধারণ*
- *নবী মুহাম্মদ সা. সকল মানুষের, এমনকি তার প্রাণের শত্রুদেরও কল্যাণ চাইতেন*
- *মুসলিম প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না বরং সে সর্বদা লোকদেরকে ক্ষমা করতে ভালোবাসে*

* *দয়া এবং অনুগ্রহ দ্বারা নবী মুহাম্মদ সা. তার শত্রুদের অন্তর জয় করতে সক্ষম হতেন*
* *দয়া ও অনুগ্রহ ঈমানদারের সবচেয়ে বড় দুটি অস্ত্র, যা প্রাণের শত্রুকে বন্ধু বানাতে পারে*
* *ইসলাম প্রচারের জন্য এমন লোকদের খোঁজা উচিত, যারা সরাসরি সত্যকে স্বাগতম জানায়*
* *নবীজির হিজরতের দিনটি কে ইসলামী ক্যালেন্ডার এর প্রথম দিন হিসেবে গণ্য করা হয়।*
* *ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিক্ষার সাথে দিন তারিখ ও অনুষ্ঠানই কেবল মুমিনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ*

অনুশীলনী ৩৩

১। নিচের শব্দ ধাঁধা হতে শব্দগুলো খুঁজে বের কর।

ইয়াসরিব	হিজরত	হত্যা	কুরাইশ	সাওর	মুহাম্মদ	মাকড়সা	কবুতর	ভয়	সুরাকা

ই	হি	হ	ভ	ই	ভ	য়	হি	ত	হি
য়া	ই	ত্যা	স	স	শ	স	ত	ই	জ
স	শ	ভ	শ	মা	ক	ড়	সা	ভ	র
রি	সু	রা	কা	হি	বু	ই	য়া	স	ত
ব	শ	হি	ত	সা	ত	ক	মু	হি	জ
ই	সা	ক	সা	ও	র	ই	হা	সা	ই
শ	কু	রা	ই	শ	ভ	স	ম্ম	ভ	হি
ক	ভ	হি	জ	ত	ক	সা	দ	ত	সা

পাঠ ৪
ইসলামের বিজয়

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

প্রচারণা, অনুসরণ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ইসলাম বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে

ইসলামের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করতে কুরাইশগণ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীন রক্ষার্থে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য আসে

বিজয়ের পরও মুমিনগণ বিনয় অবনত থাকে ও বিজিতদের ওপর করুনা দেখায়

নবী মুহাম্মদ সা. এর সাহসিকতা এবং ধৈর্যের কারণেই আজকে আমরা মুসলমান হতে পেরেছি

মদিনা একটি বরকতময় নগরী। নবী মুহাম্মদ সা. এর হাতে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় মদিনায়। মুসলমানরা মদিনায় অত্যন্ত শান্তির সাথে বসবাস করছিলেন। মুসলমানরা নির্বিঘ্নে ইসলামের অনুশীলন ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

প্রতিদিনই মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। কুরাইশরা এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়। মক্কার কাফেররা বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে। ইহুদি ও মুনাফিকরা বন্ধু সেজে ভিতর থেকে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে তৎপর ছিল। আল্লাহ মুমিনদের সকল দিক থেকে সহযোগিতা করেন এবং কাফেররা পরাজিত হয়। অবশেষে কুরাইশরা তাদের সকল ক্ষমতা ও প্রভাব হারিয়ে ফেলে।

নবী মুহাম্মদ সা. মক্কা বিজয় করেন এবং গোটা আরব তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নবী মুহাম্মদ সা. তার শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং কোন প্রতিশোধ নেননি। ইসলামের বাণী এভাবেই বিশ্বের সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম প্রচারে নবী মুহাম্মদ সা. এর সফলতার কারণেই আজ আমরা মুসলিম।

অনুশীলনী ৩৪

১। উত্তরের সঠিক অংশ বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত কর।

ক. মদিনা ছিল একটি **বরকতময় / অভিশপ্ত** শহর।

খ. মুসলমানরা মদিনায় **শান্তির / ভয়ের** সাথে বসবাস করছিল।

গ. ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় **মদিনায় / জেরুজালেমে**।

ঘ. প্রতিদিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃ**দ্ধি পাচ্ছিল / কমে যাচ্ছিল**।

ঙ. কুরাইশরা মুসলমানদের **ক্ষতি / সাহায্য** করতে চাইল।

চ. কাফেররা **মুসলমানদেরকে / খ্রিস্টানদেরকে** বিশাল আর্মি নিয়ে আক্রমণ করল।

ছ. ইহুদি এবং মুনাফিকরা মুসলমানদের **বন্ধু / শত্রু** সেজে ক্ষতি সাধনে লপ্ত হল।

ঝ. **আল্লাহ / নবী মুহামাদ সা.** মুসলমানদেরকে সাহায্য করলেন এবং রক্ষা করলেন।

জ. অবশেষে **কোরাইশরা / নবী মুহাম্মদ সা.** চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেন।

ঞ. নবী কাফেরদের কাছ থে**কে প্রতিশোধ নিলেন / তাদের ক্ষমা করলেন।**

ট. ইসলামের বাণী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল / ছড়িয়ে পড়ে নাই।

ঠ. **মুসলিমগণ / ইহুদিগণ** শেষ নবী মুহাম্মাদ সা. এর অনুসারী।

মহানবীর আত্মত্যাগ ও ইসলামের বিজয়

মদিনা ছিল একটি বরকতময় নগরী। সে নবী মুহাম্মদ সা. এবং মুসলিমগণ শান্তিতে বসবাস করছিলেন। সেখানে কোন ধরনের বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ইসলামের বাণী প্রচার সম্ভব হচ্ছিল আর প্রতিদিন নতুন নতুন লোক ইসলামে প্রবেশ করছিল। নবী মুহাম্মদ সা. ও মুসলমানগন মদিনায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ করলেন। সে মসজিদে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করা হয় না। মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার আযান দেওয়া হতো এবং মুসলমানরা সম্মিলিত হয়ে সেই মসজিদের জামাতে সালাত আদায় করত। মদিনায় মুসলমানরা নিরাপদে রোজা রাখতে এবং অন্যান্য ভালো কাজ করতে পারতো।

মদিনায় মুসলমানদের সুখী ও আনন্দময় জীবনযাপনের কথা কুরাইশদের কাছে পৌঁছল। তারা জানতে পারল, প্রতিদিন নতুন নতুন লোক ইসলামে প্রবেশ করছে এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়েই চলছে। মুসলমানদের এ উন্নতি ও সুখ-শান্তি কিছুতেই তারা মেনে নিতে পারছিল না। তারা হিংসায় জ্বলে উঠলো। মুহাম্মদ সা. ও তার অনুসারীরা সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকবে তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। তাই কুরাইশগণ গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা মুসলমানদের শান্তি বিঘ্নিত করে দিতে বিভিন্ন ধরনের দুষ্ট পরিকল্পনা করলো।

তারা বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে একের পর এক মদিনা অভিমুখে যাত্রা করলো এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। কুরাইশদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রতিবারই কম ছিল। তাদের হাতে ছিল না তেমন কোন অস্ত্র। ছিল না যুদ্ধের উপযোগী প্রয়োজনীয় ঘোড়া এবং সৈন্য। কিন্তু তাদের সাথে ছিল আল্লাহর সাহায্য, যিনি সর্বশক্তিমান। কুরাইশরা যত বারই মুহাম্মা সা. ও মুসলমানদের আক্রমণ করেছে তত বারই তারা পরাজিত হয়েছে। নবী মুহাম্মদ সা. ও তার অনুসারীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। কিছু মুসলমান যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হলেন। কিন্তু কাফেরদের ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

কুরাইশদের দুষ্টুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা মদিনাকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করল। যাতে মদিনার মুসলমানদের কাছে কোন দিক থেকে খাদ্য ও পানীয় না আসতে পারে। কিন্তু আবারো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য সাহায্য এবং বিজয় আসলো। একটি শক্তিশালী মরুঝড় কুরাইশ বাহিনীকে তছনছ করে দিল।

মুসলমানরা এখন চতুর্দিক থেকে শত্রু বেষ্টিত। এমনকি মদিনায়ও যারা ইহুদি এবং মুনাফিক ছিল তারা শত্রুতায় লিপ্ত হলো। তারা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমানদের বন্ধু হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা সবসময়ই মুসলমানদের শত্রুতা করে যাচ্ছিল এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে মদিনাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের শক্তি ও সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে আল্লাহর ওয়াদাকৃত কিছু সাহায্য আসতে লাগলো। বিভিন্ন আরব গোত্র দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক আসত মদিনায়। তারা আসতো নবী মুহাম্মদ সা. এর কথা শোনার জন্য এবং তার কথা শুনে তারা ইসলাম গ্রহণ করত।

অবশেষে কুরাইশরা তাদের সকল শক্তি এবং ক্ষমতা হারালো। আর আসলে এটাই হওয়ার কথা ছিল। কারণ যে বা যারা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিঃসন্দেহে তাদের পরাজিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশেষে বিজয়ের সেই সোনালী দিন আগমন করলো। যেদিন নবী মুহাম্মদ এবং তার সাহাবীগণ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেই সাথে মুসলমানদের সাথে যুক্ত হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা। মক্কার চতুর দিক থেকে মুসলমানদের আগমন বার্তা ও তাকবীর শুনে মক্কা নগরী যেন কেঁপে উঠল।

মক্কার কুরাইশ নেতারা এখন কারো কাছে যাওয়ার নেই। কোথাও থেকে সাহায্য পাওয়ার নেই। এমনকি যে দেব-দেবীদের তারা আজীবন উপাসনা করে আসছিল তাদের কাছ থেকেও কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। কারণ তারা নিজেরাই জানে এই সমস্ত দেব-দেবী না কোন কথা বলতে পারে, না কাউকে সাহায্য করতে পারে। এমন কি তাদের মুখের উপর কোন মাছি এসে বসলে সেটাও তারা সরিয়ে দিতে অক্ষম।

কিন্তু নবী মুহাম্মদ সা. অন্যদের মতো নন। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তিনি মক্কাবাসীর প্রতি সাধারন ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, 'হে মক্কাবাসীরা! আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করবো না। তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম'। তিনি যে আল্লাহর নবী তার এই দয়া এবং ক্ষমার বাণী শুনে সবাই এটা ভালোভাবে উপলব্ধি করল। তাই মক্কার লোকজন কোন দ্বিধা না করে ইসলামে প্রবেশ করল। মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে আশেপাশের গোত্রগুলো দ্রুত ইসলামে প্রবেশ করলো। এভাবেই ইসলামের বাণী সর্বত্র প্রসারিত হতে লাগলো। ইসলাম প্রচারিত হলো এক যুগ থেকে আরেক যুগে। আজকে আমরা

যারা মুসলমান তারাও সেই ইসলাম প্রচারের কারণেই। নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন সর্বশেষ নবী। ইসলামের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানি পেশ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন চরম ধৈর্য। তার সেই আত্মত্যাগ, কুরবানি এবং ধৈর্যের ফলেই আজকে বিশ্বে মুসলমানদের বিশাল সংখ্যা।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক / অবিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *মক্কার পরে মদিনায় হচ্ছে সবচেয়ে বরকতময় নগরী ও ইসলামের প্রাণকেন্দ্র*
- *শেষ নবীর হাতে ইসলামের প্রথম মসজিদ মদিনায় নির্মিত হয়েছিল*
- *প্রচার, অনুশীলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল*
- *ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সম্মিলিতভাবে কাজ করা*
- *ইসলামের সফলতায় অবিশ্বাসী নেতারা ঈর্ষান্বিত হয় ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়*
- *অবিশ্বাসীরা ইসলামকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে*
- *আল্লাহ সর্বদা তার দ্বীন-ইসলামকে এবং তার অনুসারী মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন*
- *অবিশ্বাসীরা তাদের অস্ত্র এবং সৈন্য শক্তির ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে*
- *মুসলমানরা সব সময় তাদের বিশ্বাসের ক্ষমতা এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখে*
- *ইসলাম রক্ষার্থে মুসলমানকে অবশ্যই তার জান-মাল সবকিছু মিলিয়ে দিতে হবে*
- *যুদ্ধে সত্যিকারের ঈমানদার কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অবিশ্বাসীরা*
- *মুসলিম যখন আল্লাহ এবং তার দ্বীন রক্ষার্থে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন সমস্ত সৃষ্টি জগৎ তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে*
- *ইসলামের সবচেয়ে বিপদজনক শত্রু হলো মুনাফিক এবং ইহুদীরা যারা বন্ধু সেজে ভিতর থেকে অতি সাধন করে*
- *মিথ্যা এবং অবিশ্বাসের অধিকারীদেরকে অপরাজেয় মনে হলেও অবশেষে তারাই পরাজিত হয়*
- *কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে আল্লাহ ঈমানদার এবং মুনাফিকদের বাছাই এবং ছাটাই করে নেন*
- *যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহ তাদেরকে অপদস্ত করেন*
- *ফেরেশতারা সব সময় সত্যিকারের ঈমানদারদের পাশাপাশি থেকে আল্লাহর জন্য লড়ে যায়*
- *প্রয়োজনের সময় কোন অবিশ্বাসীকে মুসলমানদের সাথে পাওয়া যায় না*
- *বিজয় আসলেও মুসলমানরা বিনম্র এবং দয়া প্রদর্শন করে*
- *নবী মুহাম্মদ সা. হলেন মানবতার জন্য দয়ার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ*
- *নবী মুহাম্মদ সা. এর সাহস, ধৈর্য্য এবং তার আত্মত্যাগের কারণেই আজকে আমরা মুসলিম*
- *আল্লাহ যেন আমাদের প্রিয় নবীর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করেন*

অনুশীলনী ৩৫

১। উপরের আলোচনার আলোকে মহানবী মুহাম্মদ সা. এর চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি গুণাবলি লিখ।

__________ __________ ________ ____________ __________

২। মহানবী মুহাম্মদ সা. এর সময়ে মুসলিম সৈন্যরা শত্রুর মোকাবেলায় কী কী যুদ্ধাস্ত্র ব্যাবহার করতো ? নিচে এমন পাঁচটি অস্ত্রের নাম লিখো। (প্রয়োজনে অন্য কারো সাহায্য নিতে পারো)

__________ __________ ________ ____________ __________

হেকায়াতে সাহাবা
(সাহাবীদের জীবনী)

শিক্ষক ও অভিভাবক:

ইসলামের প্রথম চার খলিফার শাসনামলকে আল- খিলাফাহ আর-রাশিদাহ (সত্য পথপ্রাপ্তদের খেলাফত) বলা হয়। এটাকে ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে খলিফাগণ ছিলেন ইসলাম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। আর তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা ছিল সম্পূর্ণরূপে কোরআন এবং নবী মুহাম্মদ সা. এর সুন্নাহ অনুযায়ী। পরবর্তীতে তাদের অনুসরণে অনেক মুসলিম শাসক সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তারা প্রথম যুগের সেই চার খলিফাদের ন্যায় তাকওয়া পরহেজগারী ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের উদাহরণ পেশ করতে পারেননি।

ইসলামের ইতিহাসে অনেক শাসক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু তাদের অবদান ও ব্যক্তিগত চরিত্রকে প্রথম যুগের সেই খলিফাদের অবদান এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকেই পরিমাপ করা হয়। স্বর্ণযুগের চার খলিফাদের যে বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল তা কেবল ইসলামের ইতিহাসেই অসাধারণ নয় বরং বিশ্বের ইতিহাসেও অতুলনীয়। সেই স্বর্ণযুগের শাসনামলের মহত্ব খলিফাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের একক মহত্বের মাধ্যমেই নির্ণয় হয়। তারা বিশেষভাবে নবী মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্বের গুণাবলি দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। তাদের ব্যক্তি চরিত্রের উন্নত গুণাবলি গুলোও নবী মুহাম্মদ সা. এর ব্যক্তি চরিত্রে পাওয়া সহজ সরল জীবন যাপন, আন্তরিকতা এবং পরহেজগারীর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। মানুষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং উদার। কিন্তু সেই একই সাথে যুদ্ধের ময়দানে তারা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং বলিষ্ঠ । তারা অত্যন্ত পবিত্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু ইসলামের কারণে সহযোগিতা এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অত্যন্ত দানশীল।

মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও তারা ছিলেন অত্যন্ত ইনসাফ পূর্ণ এবং স্বচ্ছ। তাদের আত্মোৎসর্গ এবং আন্তরিকতার কারণেই তারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। তারা নবী মুহাম্মদ সা. এবং তার শিক্ষা কে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং সর্বদা ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। আলখোলাফা আর রাশিদুন বা সঠিক পথ প্রাপ্ত খলিফাগনের জীবন এবং তাদের রেখে যাওয়া উদাহরণ আমাদেরকে এটা দেখায় যে, যদি আমরা সত্যিই একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রথমেই আমাদের চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। ইসলাম কেবল অন্যের কাছে কিছু প্রচার করা নয় বরং এটা হচ্ছে এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যা প্রথমে নিজেকে অনুসরণ করে দেখাতে হবে। প্রকৃত মুসলিম তো সেই যে নিজে কোরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণ করে এবং সাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম যুগের মুসলমানদের আদর্শকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের অনুসরণ করে। মুসলিম কেবল অন্যের কাছে তা অনুসরণের আশা করে না যা সে বিশ্বাস করে বরং সে নিজেও প্রথমে তা অনুসরণ করে দেখায়।

পাঠ ১
খলিফা ওমর রা.

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. এর দ্বীনদারী ও তার অর্জন সমূহ

ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রুও ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী হতে পারে

একজন শাসককে অবশ্যই সাধারণ জনতার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে

বিধবা ও এতিমের ন্যায় অসহায় ও অভাবী লোকেজন সাহায্য পাওয়ার বেশি হকদার

একজন আল্লাহ ভীরু শাসক আখেরাতে জবাবদিহির ভয়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে

একজন খলিফার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো জনসাধারণের সমস্যা উপলব্ধি এবং তার সমাধান করা

হযরত ওমর রা. ছিলেন মক্কার কুরাইশদের একজন প্রভাবশালী নেতা। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে তিনি ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন। কুরাইশদের কাছে তিনি নবী মুহাম্মদ সা. কে হত্যার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। নবী মুহাম্মদ সা. ওমরের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করেছিলেন। আল্লাহ নবীর দুয়া কবুল করেন আর তার পর পরই ওমর রা. ইসলাম কবুল করেন।

হযরত আবু বকরের পরে ওমর রা. ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা. এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর। ওমর রা. ছিলেন একজন অত্যন্ত সাহসী এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তি যাকে সকলে ভয় পেতো। তার ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলাম চর্চার সুযোগ পায়। তিনি বহু যুদ্ধ অংশ নিয়ে ইসলামের জন্য বিজয় আনতে সহযোগিতা করেছেন।

হযরত ওমর রা. ছিলেন জ্ঞান এবং পরহেজগারিতে শ্রেষ্টদের একজন। আবু বকর রা. এর ইন্তেকালের পর তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নির্ভিক। তিনি রোমান ও পারসিকদের বহু যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেন।

তার শাসনামলে ইসলাম দূর দূরান্তের বহু দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য তিনি ছিলেন অতি দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ও নির্মোহ জীবন যাপন করতেন। ওমর রা. অবসর সময়ে গরিব, বিধবা এবং এতিমদের খেদমত করতেন। ওমর রা. ছিলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ মানব ও মহান খলিফাদের একজন।

অনুশীলনী ৩৬

১। নিচের ঘরে রক্ষিত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

শত্রু রোমান ওমর সাহসী দ্বিতীয় কঠোর ন্যায়পরায়ণ প্রতিজ্ঞা ইসলামের নির্মোহ

ক. ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে ওমর রা. ইসলামের চরম ------------ ছিলেন।

খ. কুরাইশদের কাছে তিনি নবী মুহাম্মদ সা. কে হত্যার -------------করেছিলেন।

গ. হযরত আবু বকরের পরে ---------- রা. ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা. এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর।

ঘ. ওমর রা. ছিলেন একজন অত্যন্ত ----------- এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তি যাকে সকলে ভয় পেতো।

ঙ. তার ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলাম চর্চার সুযোগ পায়।

চ. আবু বকর রা. এর ইন্তেকালের পর তিনি ইসলামের ------------ খলিফা নির্বাচিত হন।

ছ. আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ---------ও নির্ভিক।

জ. তিনি ------------ ও পারসিকদের বহু যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেন।

ঝ. মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য তিনি ছিলেন অতি দয়ালু ও ----------------------।

ঞ. তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ও -------------জীবন যাপন করতেন।

ট. ওমর রা. ছিলেন -------------- শ্রেষ্ঠ মানব ও মহান খলিফাদের একজন।

খলিফা ওমর রা. ও জন কল্যাণ

হযরত ওমর রা. ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রা. এর ইন্তেকালের পর তিনি মুসলমানদের নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন। আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা হিসেবে হযরত ওমর রা. ছিলেন অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এবং পরোপকারী ব্যক্তি।

তিনি একজন অমুসলিমকে ও সেভাবে দেখাশুনা করতেন যেভাবে একজন পিতা তার সন্তানকে দেখাশোনা করে। এ কাজ করার জন্য ওমর রা. তার সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োগ করতেন। তিনি রাতের আঁধারে ঘুরে ঘুরে লোকদের অবস্থা দেখতেন। সাহায্য প্রার্থী ও অভাবী কাউকে পেলে তাৎক্ষণিক সাহায্য করতেন।

একদা গভীর রাতে ওমর রা. মদিনার গলিপথ দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ একটি জীর্ণ কুঠির থেকে শিশুর কান্না ভেসে এলো। কান্না শুনে খলিফা থমকে দাঁড়ালেন। তিনি কান্নার কারণ অনুসন্ধান

করতে লাগলেন। দেখতে পেলেন, এক মহিলা কয়েকটি শিশু নিয়ে তাঁবুতে বসে আছে। মহিলাকে খুবই দুঃখিত দেখাচ্ছিল। আর শিশুদের মনে হচ্ছিল ক্ষুধার্ত। ওমর রা. দেখলেন আগুনের চুলায় একটি পাতিল বসানো।

ওমর রা. ভাবলেন, নিশ্চই সেই পাত্রে খাবার আছে আর মহিলা বাচ্চাদেরকে এখান থেকে খাবার দেবে। ফলে তারা কান্না বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হচ্ছে তা না দেখে ওমরের কোমল মন শান্ত হলো না। তিনি দেখলেন, কিছুক্ষন পর মহিলাটি আগুনের চুলা থেকে পাত্র সরিয়ে নিলো কিন্তু শিশুদের সে কোন খাবার দিচ্ছে না। এতে ওমর রা. বিস্মিত হলেন। তিনি আসল ঘটনা জানতে আরো আগ্রহী হলেন।

অবশেষে ওমর মহিলাটির অনুমতি নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলেন। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয় মা, বাচ্চারা কেন কাঁদছে? মহিলা জবাব দিলেন, বাচ্চারা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে। "খাবারের পাত্রে কি কোন খাদ্য নেই?" ওমর জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা ওমরের খুব কাছাকাছি এসে কানে কানে বলল, "শিশুদের বলবেন না পাত্রে যে খাবার নেই।" কারণ তারা ভাবছে, পাত্রে খাবার আছে আর খাবার তৈরিতে দেরি হচ্ছে। আর আমি চাচ্ছি, তারা এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। আমার খাদ্য কেনার কোন টাকা না থাকায় এ অবস্থা হয়েছে। মহিলাটি ওমর রা. এর কাছে তার পরিবারের দুরবস্থার কথা খুলে বললো। সে বলল, তার স্বামী ইতোপূর্বে মারা গেছে। আর তখন থেকেই তারা খাদ্য সমস্যায় পড়েছে। মহিলাটি বলল, দুর্ভাগ্যবশত খলিফার বায়তুল মালের দায়িত্বে যারা আছেন, তারা আমাদের বিষয়টি অবগত নন। তারা যদি আমাদের অবস্থা জানতে পারতেন, তাহলে তারা হয়তো আমাদেরকে সাহায্য করতেন।

মহিলার কথায় মানব প্রেমিক খলিফার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল। "তুমি কেন সরাসরি খলিফাকে এই কথাগুলো বলোনি?" 'আমি একজন মহিলা' সে উত্তর দিল, "আর আমি খলিফাকে খুঁজে বের করে তাকে আমার সমস্যা বলব তা আমার জন্য সহজ ছিল না। তিনি যদি সত্যিই খলিফা হয়ে থাকেন, তাহলে তো তিনি আমাদের খোঁজ নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। এটা তার দায়িত্ব যে, তিনি মানুষের দুরবস্থা জেনে তার সমাধান দেবেন। আমি মনে করি আমাদের খলিফা তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না।" সে বলতে থাকলো, "ওমর আমাকে হতাশ করেছেন। অভাবী ও ভুখা নাঙ্গা মানুষের সাথে যদি তার আচরণ এমন হয়, তাহলে আমি মনে করি তার খলিফা না হওয়াই উচিত ছিল ।"

"কিন্তু ওমর কিভাবে তোমাদের অসুবিধার কথা জানবেন। তুমি যদি তার কাছে যাও, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।" ওমর চোখের পানি ফেলে মহিলাকে বললেন। মহিলা অত্যন্ত সান্তভাবে জবাব দিল, "তিনি যদি সত্যিই আমাদের খলিফা হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখা তার নিজের উচিত। আমরা তার কাছে অভাব-অভিযোগ নিয়ে না যেতে পারলেও তার উচিত আমাদের খুঁজ নিয়ে আমাদের সমস্যা দূর করা।"

ওমর মহিলার কথা শুনে হতবাক হয়ে পড়লেন। ওমর দেরি না করে সেখান থেকে বায়তুল মালের উদ্দেশ্যে দৌড় দিলেন এবং বায়তুল মাল থেকে কিছু খেজুর, ময়দা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী বস্তাবন্দি করে কাঁধে তুলে নিলেন। যখন ওমর কাঁধে বস্তা নিয়ে বের হচ্ছিলেন তখন তার একটি কর্মচারী বলছিল, "প্রিয় খালফা! বস্তাটি আমার কাঁধে তুলে দিন। আমি তা যথাস্থানে পৌঁছে দেব।"

"এ বস্তাটি আমাকেই বহন করতে হবে" ওমর রা. উত্তরে বললেন। "কেয়ামতের দিন তুমি আমার কাঁধের বোঝা অবশ্যই বহন করবে না। তাহলে আজকে আমার এ বস্তা কেন আমি তোমার কাঁধে তুলে দেবো। কিয়ামতের দিন তো আল্লাহ এই মহিলা সম্পর্কে আমাকেই প্রশ্ন করবেন।"

খলিফা নিজ কাঁধে করে খাদ্য নিয়ে মহিলার ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। খাদ্যগুলো পেয়ে মহিলা সাথে সাথেই রান্না করে তার বাচ্চাদেরকে দেওয়ার জন্য তৈরি করল। খাদ্য তৈরিতে ওমর রা. নিজে মহিলাকে সাহায্য করলেন। খাদ্য রান্না হলে খলিফা নিজ হাতে শিশুদের মুখে তুলে খাওয়ালেন। শিশুদের মুখে এবার হাসি ফুটল। তারা খিল খিল করে হাসছিল আর দৌড়াদৌড়ি করছিল। এ দৃশ্য ওমরের মনে কিছুটা সান্তনা ও আনন্দ এনে দিল।

ওমর রা. মহিলার ঘর থেকে বের হয়ে যাত্রা শুরু করলেন। পিছন থেকে মহিলা ডেকে জিজ্ঞেস করল, জনাব, আপনার পরিচয় তো জানা হলে না। আপনার নাম কি এবং আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে? আমি মনে করি, ওমর না হয়ে আপনারই খলিফা হওয়া উচিত ছিল। আপনি অত্যন্ত দয়ালু, দানশীল এবং জনদরদী। আর একজন খলিফার এমনই হওয়া উচিত। মহিলার কথায় ওমর রা. মুচকি হাসলেন আর বললেন, আপনি যখন আগামীকাল খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবেন, তখন আমাকে সেখানে পাবেন। মহিলাটি ধাঁধায় পড়ে গেল। 'আমি বুঝতে পারছি না' সে বলল। "হ্যাঁ, আমি ওমর" খলিফা বললেন। "এটা ছিল আমারই ভুল। আমি তোমাদের সঠিক খোঁজখবর নিতে পারিনি। তবে এখন তোমার সন্তানরা পেট ভরে খেয়ে আনন্দে ঘুমাতে পেরেছে। আর আজ থেকে আমি বায়তুল মালের পক্ষ থেকে তোমার জন্য একটি বরাদ্দ নির্ধারণ করে দেব। যাতে তুমি তোমার সন্তানদের ভালোভাবে দেখাশোনা ও খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করতে পারো।"

হযরত ওমর রা. এর জনগণের প্রতি ভালোবাসা এবং সহানুভূতির এ ছিল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোন শাসক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার ভয়ে একদিকে শত্রুরা থাকে আতঙ্কিত, অপরদিকে জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও দয়ায় তার হৃদয় থাকে পরিপূর্ণ। তিনি হলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর রা. বিশ্বের ইতিহাসে যার শাসনকালকে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয়।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক / অবিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *হযরত ওমর রা. ছিলেন অত্যন্ত কষ্ট সহীষ্ণু আল্লাহর এক নিষ্ঠাবান বান্দা, যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হয়েছিলেন*
- *একজন শাসকের জনগণকে তেমনি ভালোবাসা উচিত, যেমন পিতা তার সন্তানকে ভালোবাসে*
- *একজন শাসক সাধারণ জনগণকে এমনভাবে সহযোগিতা করবে, যেন সে নিজে তাদের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে*
- *প্রকৃত জনদরদী শাসক নিজে রাতে বিছানায় আরাম করার চাইতে জনগণ শান্তিতে আছে কিনা তা ঘুরে দেখে*
- *ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতা মানব জীবনে দুঃখ এবং দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে*
- *স্বামীহীন বিধবা একজন মহিলার জীবন পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টকর, তাই রাষ্ট্রের উচিত তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া*
- *বিধবা এবং এতিমদের দেখাশোনা ও ভরণ পোষণের সমপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে শাসকের উপর*
- *শাসকের দায়িত্ব হচ্ছে নিজ উদ্যোগে জনগণের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া*
- *শাসক জনগণের কাছে তার সেবা পৌঁছাবে, জনগণ তার কাছে এসে অভিযোগ পেশ করার আগে*
- *যে শাসক দরিদ্রকে অবহেলা করে সে জনগণ দ্বারা ঘৃণিত হয়*
- *মানুষের দুঃখ বেদনা দেখলে প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির মন কেঁদে উঠে ও চোখে পানি চলে আসে*
- *একজন ধর্মপান ঈমানদার শাসক জনগণের সমস্যা ও প্রয়োজন শুনে সাথে সাথেই পূরণের চেষ্টা করে*
- *প্রকৃত ঈমানদার শাসক জনসেবার মূল প্রাণ শক্তি পায় আল্লাহর ভয় থেকে*
- *একজন ঈমানদার শাসক বিশ্বাস করে তার শাসনাধীন কোন মানুষ কষ্ট পেলে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে*
- *যে শাসকের ভিতরে আল্লাহর ভয় নেই সে জনগণের দুঃখ বেদনার বিষয়টিকে অনেক সময় এড়িয়ে যায়*
- *তাই আল্লাহকে ভয় করে এবং একই সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা রাখে এমন ব্যক্তি ই রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিক উপযোগী*
- *কেয়ামতের দিন একজন শাসক তার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে*
- *শাসক যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব অঞ্জন না দেয় তবে তাকে অবশ্যই আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে*
- *ক্ষমতাবানরা দুর্বলদেরকে সেবা দেবে এবং দুর্বলরা ক্ষমতাসীনদের সেবা করবে না*
- *একজন পুরুষেরও রান্না বান্নার মত কাজ জানা উচিত এবং প্রয়োজনে ঘরের কাজে সহযোগিতা করা উচিত*
- *মানুষের মনে আনন্দ ও মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়*
- *একজন উপকৃত খলিফার অনন্য গুণ হল দয়া, সহানুভূতি এবং প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি*
- *একজন প্রকৃত খলিফার ভূমিকা শত্রুর মনে ভয় জাগরণ করবে এবং একই সাথে তার নিজ জনগণের অন্তরে ভালোবাসার স্থান করে নেবে*
- *মুসলমানরাই প্রথম 'বায়তুল মাল' (সরকারি কোষাগার) প্রতিষ্ঠা করেছিল যার থেকে দরিদ্র জনগণকে মাসিক ভাতা দেয়া হতো*

অনুশীলনী ৩৭

১। নিচের শব্দ ধাঁধাটি পূর্ণ কর।

পাশাপাশি

১. যিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।
২. খলিফা ওমর ------------অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।
৩. ওমর শাসন করেছিলেন অর্ধ ---------
৪. মুসলিম শাসকদের উপাধি।
৫. সরকারি কোষাগার বোঝাতে ব্যবহৃত আরবি পরিভাষা।

৬. আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে হযরত ওমর ছিলেন অত্যন্ত ---------------।

উপর-নিচ

৭. তিনি ওমরের পূর্বে মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন।
৮. ওমর তাদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয়ী হন।
৯. যিনি ওমরের ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করেছিলেন।
১০. যে শহর থেকে খলিফা ওমর তার রাজ্য শাসন করতেন।
১১. ওমর অত্যন্ত ------------- জীবন যাপন করতেন।
১২. যে মহিলা তার স্বামী হারিয়েছে।
১৩. ইতিহাসে ওমরের কীর্তি আছে স্বর্ণাক্ষরে -------------।

ও ১	ম ১২	র		বি ১২		শ২	ক্র	দে	র১০
	দি			ধ৩	র	ণী		রো ৮	সূ
আ৭	না			বা৫	য়	তু	ল	মা	ল
বু		সা ১১						ন	
ব		ধা		খ ৪	লি ১৩	ফা			
ক৬	ঠো	র			খি				
র		ণ			ত				

২। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. নিম্নলিখিত স্মরণীয় বানীগুলো শিখে নাও।

ক. কেবল নামাজ রোজার দ্বারা নয় বরং সত্যবাদিতা এবং বুদ্ধিমত্তা দেখে ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করবে।
খ. ফোরাত তীরে একটি ছাগলও না খেয়ে মরলে উমরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।
গ. আল্লাহকে স্মরণে রাখো, কারণ এটা ঔষধ আর মানুষের কাছে স্মরণীয় হওয়া থেকে বাঁচো কারণ এটা রোগ।
ঘ. আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যে আমরা ভুল ধরিয়ে দেয়।
ঙ. যে নিজেকে জ্ঞানী দাবি করে সে মূলত অজ্ঞ।

পাঠ ২
হযরত ফাতিমা রা.

শিখন উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে

ইসলামে হযরত ফাতেমা রা. এর মর্যাদা এবং তার অবদান

তার পিতা মুহাম্মদ সা. ও ইসলামের প্রতি তার দায়িত্ববোধ কেমন ছিল

একজন মহিলার অন্যতম উন্নত গুণ হলো নিজ পরিবার-পরিজনের প্রতি যত্নবান হওয়া

মুসলিম মহিলাদেরকে সর্বাবস্থায় পর্দা মেনে চলতে হবে

একজন মুসলিম শাসক কখনো স্বজন প্রীতির মত অন্যায় করতে পারেন না

সরল জীবন যাপনে যে আনন্দ ও পুরস্কার পাওয়া যায়, তা অন্য কোনভাবেই সম্ভব নয়

আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিরা কেবল পরকালের সুখ শান্তির জন্যই কাজ করে

হযরত ফাতিমা রা. ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা. এর কনিষ্ঠ মেয়ে। ফাতেমা রা. দেখতে তার মা খাদিজা রা. এর মত ছিলেন। স্বভাব ও গুনে তিনি ছিলেন অবিকল নবী মুহাম্মদ সা. এর মত। ফাতেমা রা. নবী মুহাম্মদ সা. এর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা ছিলেন।

ফাতেমা রা. মায়ের অবর্তমানে নবী মুহাম্মদ সা. এর খেদমত করেছেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি বীরযুদ্ধা আলী রা. কে বিবাহ করেন। স্বামী ভক্তি ও যত্ন সহকারে সন্তান লালন পালনে ফাতেমা রা. এর জুড়ি নেই। উন্নত ব্যক্তিত্ব, দয়া ও ভদ্রতার কারণে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তার আগমনে মুহাম্মদ সা. দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানাতেন ও কাছে বসাতেন।

ফাতিমা রা. ওহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়ে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি নবী মুহাম্মদ সা. সাথে ছিলেন। নবী মুহাম্মদ সা. এর ইন্তেকালের পর ফাতেমা রা. অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হন। এর মাত্র কয়েক মাস পরেই ফাতেমা রা. ইন্তেকাল করেন। ফাতেমা রা. ছিলেন একজন আদর্শ মুসলিম মেয়ে, আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ মা। তার জীবন মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি অনুকরণীয় উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে আছে।

জান্নাতি মহিলাদের রানী

ফাতেমা রা. ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রিয় মেয়ে। মুহাম্মদ সা. তখন আরবের শাসক। তা সত্ত্বেও ফাতেমা রা. এর মনে কোন অহংকার ছিল না। ফাতেমা রা. অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়ে তিনি। তা সত্ত্বেও ফাতেমা রা. ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি নিজ হাতে গৃহস্থালি কাজ করতেন। তিনি নিজ হাতে যাতা দিয়ে গম পিষতেন। অতঃপর পিষা আটা দিয়ে খামির করে রুটি বানাতেন। এ কঠিন কাজে অনেক সময় তার হাতে ফোস্কা সৃষ্টি হতো। ফাতেমা রা. চামড়ার থলে দিয়ে দূর থেকে পানি বহন করে

আনতেন। এতে তার কাঁধে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি নিজ হাতে তার ঘর পরিষ্কার করতেন। কাপড় চোপড় ধুয়ে নিতেন। কাজের কারণে অনেক সময় তার কাপড় অনেক ময়লা হতো এবং চুলগুলো এলোমেলো হতো। কিন্তু এতে তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না এবং অভিযোগও করতেন না। ফাতেমা রা. জানতেন, পরিবারের সেবা করা মহিলাদের অতি উন্নত গুণাবলির একটি।

এক কঠিন যুদ্ধের পর কিছু ক্রীতদাসী মদিনায় নিয়ে আসা হয়। যুদ্ধে অংশ নেয়ার শাস্তি স্বরূপ তাদের বন্দি করা হয়। মুসলমানদের সেবা করে তারা অপরাধের ক্ষতিপূরণ দেবে। ফাতেমা রা. এর স্বামী আলী রা. চিন্তা করলেন, স্ত্রী ফাতেমার কষ্ট কমানোর এটা একটি ভালো সুযোগ। ফাতেমার জন্য একজন ক্রীতদাসী নিয়ে আসতে পারলে অনেক ভালো হবে। তিনি ফাতিমাকে বললেন, নবী মুহাম্মদ সা. তোমার পিতা এবং তিনি তোমার কোন আবেদন কখনো ফিরিয়ে দেন না। তাহলে কেন তুমি তার কাছে গিয়ে একজন ক্রীতদাসীর আবেদন করছ না? প্রতিদিনের কাজে তোমার এত কষ্ট দেখে আমার নিজেরও কষ্ট হয়। কিন্তু আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে বলে আমি তোমাকে তেমন সহযোগিতা করতে পারিনা।

ফাতেমা রা. মনে মনে ভাবলেন, এটি ভালো পরামর্শ। তিনি নবী মুহাম্মদ সা. এর কাছে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি ঘরে ঢুকে সেখানে অনেক লোক দেখতে পেলেন। ফাতেমা রা. ছিলেন অত্যন্ত পর্দানশীল এক মহিলা। তিনি অন্য লোকের সামনে পিতার কাছে তার প্রয়োজন বলতে চাইলেন না। তিনি এটাও ভাবলেন,যদি নবী তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণে অপারগ হন, তাহলে লোকদের কাছে বিষয়টি অসুন্দর দেখাবে। তাই তিনি কিছু না বলেই শুধু সালাম দিয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

পরদিন সকালে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উদিত হলো এবং ছোট্ট পাখি মিষ্টি সুরে গান গাইলো। অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম একটি দিন। ফাতেমা রা. আনন্দের সাথে তার দিনের কাজ শুরু করলেন। তখনই তিনি নবী মুহাম্মদ সা. কে তার ঘরের দিকে আসতে দেখলেন। তিনি দ্রুত তাকে সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি তার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। নবী মুহাম্মদ সা. ও তার মেয়েকে ভালোবাসতেন অনেক বেশি। কারণ ফাতেমা রা. ছিলেন তার অত্যন্ত প্রিয় এবং অনুগত মেয়ে।

“প্রিয় মা, এখন তুমি আমাকে বলতে পারো, গতকাল কেন আমার কাছে গিয়েছিলে।” নবী সা. বললেন। ফাতেমা রা. কিছুটা লজ্জা অনুভব করলেন ও নিরব হয়ে গেলেন। “আসো, এখানে আসো এবং বলো তোমার ব্যাপারটি কি?” নবীজি তাগাদা দিলেন। কিন্তু ফাতেমা রা. লজ্জা পাচ্ছেন এবং মুখ খুলে কিছু বলছেন না। আলী রা. তখন নীরবতা ভঙ্গ করলেন, “শারীরিক ভাবে ফাতেমা খুবই দুর্বল, অথচ প্রতিদিন তাকে নিজ হাতে অনেক কাজ করতে হয়। রুটির জন্য গম পিষে আটা তৈরি ও রুটি বানানো, নিজ হাতে ঘর পরিষ্কার করা, বাহির থেকে কাঁধে করে পানি নিয়ে আসা। এসব করে তার হাতে ফোস্কা ও কাঁধের উপর দাগ পড়ে গেছে। সর্বদা ঘরের কাজ এবং সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তার অবসর নেই। আমি তাকে বলেছিলাম,

আপনার কাছে গিয়ে একজন দাসীর জন্য আবেদন জানাতে। তাই সে আপনার কাছে গিয়েছিল ।" ফাতেমা রা. এবার কিছুটা সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে তাতে সম্মতি জানালেন।

নবী মুহাম্মদ সা. তার কথায় মুচকি হাসলেন। তিনি জানতেন, ফাতেমার কষ্টটা অন্য যে কোন মহিলার চেয়ে অনেক বেশি। তিনি এও জানতেন যে, মদিনায় অনেক অভাবী লোক রয়েছে, যাদের তার দেখাশোনা করা উচিত। সবকিছুর পরেও তিনি তাদের নবী এবং তাদের শাসক। এটা তার দায়িত্ব যে, তিনি সকলকেই দেখাশোনা করবেন। এটা তার উচিত হবে না, তার নিজ মেয়েকে একটা দাসী দেওয়া এবং অন্যান্য মহিলাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। নবী মুহাম্মদ সা. এটাও জানতেন, কষ্টকর হলেও সাধারণ জীবন-যাপন থেকেও অনেক আনন্দ পাওয়া যায় এবং ইহা অনেক বড় পুরস্কার নিয়ে আসে। জীবনে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে সরল জীবন যাপনে অনেক তৃপ্তি মিলে।

নবী মুহাম্মদ সা. এটাও জানতেন, এই দুনিয়ার আরাম আয়েস তার এবং তার পরিবার পরিজনের জন্য নয়। মুমিনের সময় এ দুনিয়াতে কাটবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী এবং মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে। কেবল নিজেদের সুখ শান্তির জন্য সময় ব্যয় করা নবী পরিবারের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। তিনি জানতেন, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখই হবে মুমিনের একমাত্র কাম্য। মুমিনের প্রকৃত বাড়ি হবে চির সুখের জান্নাত।

নবী সা. তার উষ্ণ হাতটি ফাতিমার হাতের উপর রাখলেন। তারপর অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সর্বদা আল্লাহর প্রতি তোমার দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হও। নিজ পরিবার পরিজনের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন কর। যখন তুমি রাত্রে ঘুমাতে যাবে, তখন সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়বে। এটা করে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু পাবে যা দাস-দাসীর চেয়েও তোমার কাছে অত্যন্ত সাহায্যপূর্ণ হবে। ফাতেমা রা. বুঝতে পারলেন। আর তা তো হবেই, তিনি তো ছিলেন নবীর মেয়ে। তিনি আনন্দে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমি তাতেই সুখী, যা আল্লাহ এবং তাঁর নবী ভালোবাসেন।

ফাতেমা রা. সবচেয়ে সুখী মহিলাদের একজন ছিলেন এবং তিনি জান্নাতে নবীজির সাথে সর্বোচ্চ বেহেশতে অবস্থান করবেন। অসাধারণ গুণাবলি ও আত্ম ত্যাগের কারণে ফাতেমা রা. আজও দুনিয়াতে অনুসরণীয় হয়ে আছেন। আর পরকালে নবীর প্রিয় কন্যা হিসেবে তিনি হবেন জান্নাতি মহিলাদের রানী।

এই গল্প থেকে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো শিক্ষক / অবিভাবক শিক্ষার্থীদের সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবেন,

- *আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হন*
- *অভিজাত ও দ্বীনদার মহিলারা গৃহস্থালী কাজের প্রতি মনোযোগী থাকেন*
- *পারিবারিক দায়িত্ব পালন করাকে মহিলাদের একটি মহৎ গুণ হিসেবে দেখা হয়*
- *মুসলিম সমাজের সেবা করা তাদের জন্য শাস্তি, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে*
- *সেবার মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীগণ মুসলমানদের কষ্ট দানের ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে*
- *স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের গৃহস্থালি কাজে সাধ্যমত সহযোগিতা করা*
- *একজন মুসলিম মহিলা সর্বাবস্থায় তার পর্দা পুশিদা রক্ষা করে চলবে*
- *মহিলাগণ অচেনা অজানা লোকদের থেকে নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রাখবে*
- *পর্দা পালন ও পবিত্র জীবন যাপন মুমিনদেরকে অন্য লোকদের থেকে পৃথক করে*
- *লোকসম্মুখে কারো কাছে এমন কিছু চাওয়া উচিত নয়, যা দিতে অপারগ হলে সে লোকদের সামনে লজ্জিত হয়*
- *প্রয়োজনে সাহায্য প্রার্থীর কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, যেন কষ্ট করে তাকে আবার আসতে না হয়*
- *জীবনে সুযোগ-সুবিধা চাওয়া নিষিদ্ধ নয়, তবে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা অনেক বড় দ্বীনদারী*
- *শাসকের উচিত নয় সাধারণ জনগণের চাইতে তার পরিবার পরিজনকে অধিক সুবিধা দেওয়া*
- *কষ্টের মধ্যে থেকেও সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন, অসন্তুষ্ট বিলাসী জীবনের চেয়ে অনেক সুখের*
- *যারা আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসেন তাদের জন্য দুনিয়ার মাত্রাতিরিক্ত আরাম-আয়েশ নয়*
- *আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের জন্য আখেরাতে অনেক সুযোগ-সুবিধা রেখে দিয়েছেন*
- *দুনিয়ার সময় অতিবাহিত হবে আল্লাহর আনুগত্য এবং মানবতার প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমে*
- *আল্লাহর নবীগণ অত্যন্ত সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন*
- *আল্লাহর ভয় আমাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে উৎসাহ যোগায়*
- *আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে ভয় করার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন আবশ্যক*
- *জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরটি আল্লাহর সেই সমস্ত বান্দাদের জন্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন*
- *জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার একমাত্র উপায় হলো, রাসূলের অনুসৃত পথে জীবন পরিচালনা করা*

অনুশীলনী ৩৮

১। ফাতিমা রা. এর একটি উপাধি ছিল 'আয-যাহরা' যার অর্থ 'অতি চমৎকার সুন্দর ফুল'। তিনি এই উপাধি লাভ করেছিলেন কেবল তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের কারণেই নয় বরং তার চারিত্রিক সৌন্দর্যের কারণেও। এবার নিচের ফুলটিতে ইচ্ছামত রং দাও এবং আরবি লেখাটি রং দিয়ে পূর্ণ কর। তারপর নিচে তার অর্থ লিখ।

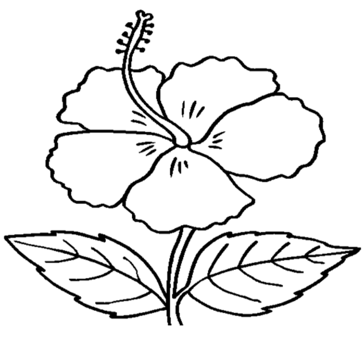

الزهراء

অর্থ: __________________

ঋণ স্বীকার

"শিশু মনে দ্বীনের আলো" সিরিজের বইগুলো ইংলিশ সিরিজ 'MY FAITH: ISLAM' এর অনুকরণে লিখিত। 'MY FAITH: ISLAM' সিরিজটি লিখেছেন প্রখ্যাত গবেষক, খ্যাতিমান শিক্ষক ও সুসাহিত্যিক মাওলানা ফয়সাল ছোটিয়া । ১৯৭০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ এ জন্ম গ্রহণকারী এ ইসলামী পণ্ডিত ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাধিক সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান "মাদ্রাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া (দার আল-উলুম আজাদভিল) তে । নিজ জন্মভূমি ছাড়াও ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে। আমার লিখিত "শিশু মনে দীনের আলো" সিরিজ উপরোক্ত সিরিজের হুবহু অনুবাদ না হলেও একে এর প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। আমার লেখা সিরিজের অধিকাংশ উপাদান এই সিরিজ থেকে নেয়া। আমি লেখকের কাছে চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ মূল লেখককে ও আমাকে উভয় জাহানের কল্যাণ দান করুন। আমিন।

‘শিশু মনে দ্বীনের আলো’ সিরিজে যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

১. ইসলামী আকাইদ ও আমল আখলাক

২. মাসনুন দুয়া দুরুদ ও এ সংকান্ত আদাবসমূহ

৩. প্রাত্যহিক জীবনের জরুরি ফিকহ ও আহকাম

৪. কুরআনের আলোকে নবীদের গল্প

৫. হাদিসের আকর্ষণীয় গল্পসমূহ

৬. নবী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সমূহ

৭. প্রথম সারির সাহাবীদের জীবনী

৮. ইতিহাসের শিক্ষণীয় গল্পসমূহ

৯. সুরা ফাতেহা সহ শেষ দশটি সূরার অর্থ ও ব্যাখ্যা

১০. সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ২০ টি হাদিসের অর্থ ও ব্যাখ্যা

‘শিশু মনে দ্বীনের আলো’ সিরিজটির অনন্য বৈশিষ্টসমূহ:

১. শিশুদের বয়স অনুপাতে বিষয় নির্বাচন

২. শিশুদের বোধগম্য ভাষা ও শব্দ চয়ন

৩. আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে সহজ উপস্থাপন

৪. নির্ভরযোগ্য উৎস হতে বিষয় সাজানো

৫. সহজ অনুশীলনী ও হাতের কাজ

৬. অধ্যায়গুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ

৭. অযথা দীর্ঘকরণ ও বাহুল্য বর্জন

৮. প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ‘এনিমেশন ভিডিও’

‘শিশু মনে দ্বীনের আলো’ সিরিজটি কেন আপনার শিশুর জন্য প্রয়োজন?

১. আপনার শিশুর কচি মনে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা তৈরী করতে

২. আপনার শিশুকে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করতে

৩. শিশুকে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও নৈতিক গুণাবলির উপর গড়ে তুলতে

৪. শিশুকে প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলায় অনুপ্রাণিত করতে

৫. শিশুকে ইসলাম শিক্ষায় অধিক আগ্রহী করতে ও খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলতে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ

Call: +44 7455847045

Web: ischoolportal.uk